KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication : ৫৪ সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, কল-৯১ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : নীহার গুহ রায় |
| Title : চতুরঙ্গ | Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৪৭/১<br>৪৭/২<br>৪৭/৩<br>৪৭/৪<br>৪৭/৫ | Year of Publication : May 1986<br>Jun 1986<br>July 1986<br>Sep 1986<br>Oct 1986 |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor : আবদুল গফুর | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

সেপটেম্বর
১৯৮৬

'শিক্ষিত বেকার'—ভবতোষ দত্ত : এই বিস্ফোরক সমস্যার তথ্যাশ্রিত বাস্তব বিশ্লেষণ

'গড় শ্রীখণ্ড থেকে রাজনগর'—অলোক রায় : এই বছরের বঙ্কিম-পুরস্কার-প্রাপ্ত বর্ষীয়ান লেখকের সাহিত্যরচনার সামগ্রিক মূল্যায়ন

'যন্ত্রবিজ্ঞান, শিল্পকলা, তৃতীয় সংস্কৃতি'—গুরুদাস ভট্টাচার্য

'রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী কার্তিক পাল'—আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অজানা অধ্যায়

আজকের অশান্ত-উত্তাল শ্রীলঙ্কার বিক্ষোভের উপাদানগুলি যাতে প্রতিফলিত এমন একটি সিনহলি উপন্যাস আর একটি গল্পসংকলনের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ নূতন দেশকালের পটভূমিতে ভিন্নতর রসের উদ্বোধক ধারাবাহিক উপন্যাস 'অলীক মানুষ'

'সংকটের আবর্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক সদ্যঃপ্রয়াত হাজী দানেশ শেখের জীবন আর সংগ্রাম —আলোচক ওই আন্দোলনেরই আর-এক নেতা অধ্যাপক সুনীলকুমার সেন

'প্রিটোরিয়ার লড়াই'—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র'—সৈয়দ আবুল মকসুদ

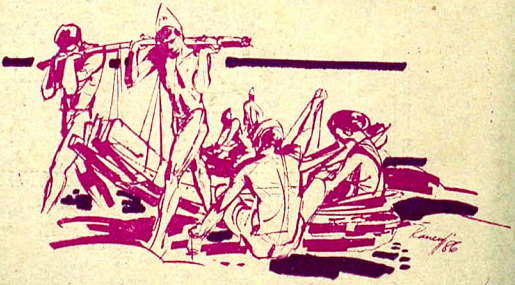

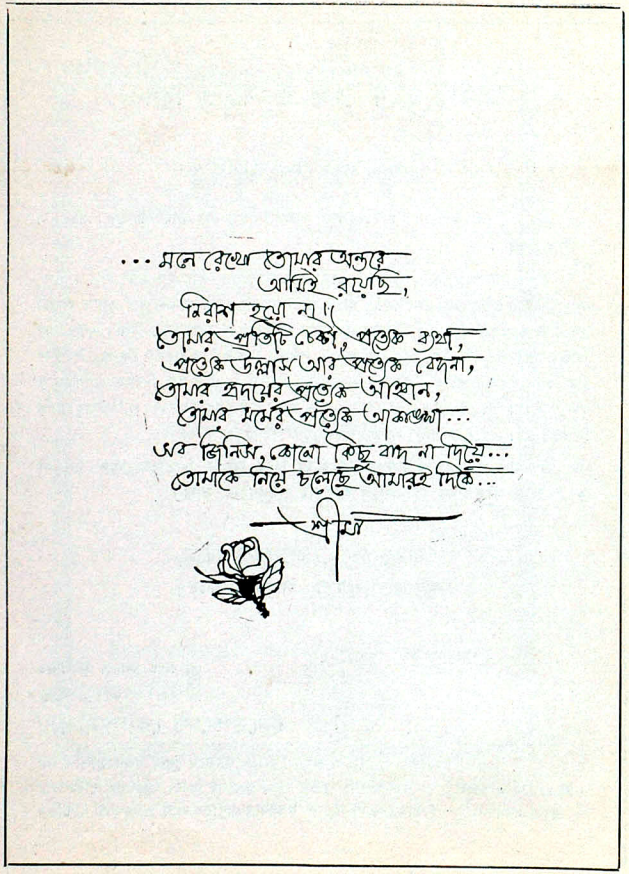



# পরিচয়

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ৫
সেপটেমবর ১৯৮৬
ভাদ্র ১৩৯৩



শিক্ষিত বেকার ভবতোষ দত্ত ৩২৫
গড় শ্রীখণ্ড থেকে রাজনগর অলোক রায় ৩৪০
যন্ত্রবিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং তৃতীয় সংস্কৃতি গুরুদাস ভট্টাচার্য ৩৬৫

বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণ ধর ৩৩০
তরু দত্ত তরুণ সান্যাল ৩৩১
মানচিত্র মূর্তজা বশীর ৩৩৩
দগ্ধ রজস্বলা রবীন সুর ৩৩৪

হানটাপতির শেষ পরাজয় শতদ্রু মজুমদার ৩৩৫
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৫৩

গ্রন্থসমালোচনা ৩৭৬
অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ চৌধুরী

বিশ্বসাহিত্য ৩৮০
সাম্প্রতিক সিনহলি সাহিত্য মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৩৮৬
রবীন্দ্রনাথ ও মৃতিকার কার্তিক পাল

বাংলাদেশ থেকে ৩৯২
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সৈয়দ আবুল মকসুদ

স্মরণে ৩৯৮
হাজী দানেশ শেখ সুনীলকুমার সেন

মতামত ৪০১
সংকটের আবর্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আলোচনা ৪০৪
প্রিটোরিয়ার লড়াই ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯



শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

# Hindustan Wires Limited

*Registered Office :*

**3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016**

Phone : 44-6745 (3 lines) Telegram : WIREFIELD

*Factory :*

**B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas**

Phone : 58-1947, 58-1934

*Manufacturere of :*

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

*And*

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle poke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

*In Technical Collaboration with*

**MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &**

**MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED**

**JAPAN**


## চতুরঙ্গ

বিশেষ ঘোষণা

আগামী অকটোবর সংখ্যা ( ৪৭ বর্ষ ৬ সংখ্যা ) প্রকাশিত হবে ১লা অকটোবর

এই সংখ্যার আংশিক বিষয়সূচী :

প্রবন্ধ :

'হিংসার বদলে'—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'আধুনিক বাংলা চিত্রশিল্প আর গ্রাফিক আর্টস—সূচনা ও কিছু কথা'—রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

বিশেষ শারদীয় রচনা :

'দুর্গাপূজায় আধুনিকতা'—অনিরুদ্ধ চৌধুরী

'ক্যাসেট পাইরেসি ও আনুষঙ্গিক সমস্যা'—দিনেন্দ্র চৌধুরী

বড়োগল্প :

'একটুকরো চিঠি'—আবুল বাশার

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ :

'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অমিতাভ বুদ্ধদেব'—গৌতম নিয়োগী

বিশ্বসাহিত্য :

আধুনিক প্যালেস্টাইনি উপন্যাস—Esmail Fassih'র—Sorraya in Coma'র আলোচনা —সৌরীন ভট্টাচার্য

গ্রন্থসমালোচনা :

The Truth Unites—Essays in Tribute to Samar Sen—কিরণময় রাহার আলোচনা

ধারাবাহিক উপন্যাস :

'অলীক মানুষ'—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

**বাংলা বই-এর খবর—৬**

নতুন লেখকের আবিষ্কার করবার মধ্যে একটা প্রীতিকর চমৎকারিত্ব আছে। সেই চমৎকারিত্ব পাওয়া যাবে **অশোক চট্টোপাধ্যায়ের** লেখার সঙ্গে পরিচিত হলে।

**সিটিয়াস**-এ আছে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ অ্যাথলেটের সংগ্রামের কাহিনী। সুদীপ্তর সংগ্রাম যেমন প্রথম হওয়ার জন্যে, ঠিক তেমনি পাশাপাশি তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল গড়ের-মাঠের বাস্তুঘুঘুদের সঙ্গে। উপন্যাসটির শেষ পৃষ্ঠায় পাঠকের জন্য আছে এক মধুর বিস্ময়—যখন মূল বিষয়কে নিপুণভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই নতুন মাত্রা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক উপন্যাসটির মূলমন্ত্রের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন, যা অলিম্পিকেরও মূল সুর—'সিটিয়াস', 'অলটিয়াস', 'হারটিয়াস'—আরো গতি, আরো উন্নতা, আরো শক্তি।

●

**নবেন্দু ঘোষের** গল্প বলার ভঙ্গী বা স্টাইল এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপন্যাসের পটভূমি গ্রাম্যজীবনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তারপর বিবিধ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা প্যারিস লণ্ডনকে ছুঁয়ে আবার বাংলার শ্যামলায়িত জীবনে ফিরে এসেছিল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নন্দরানী পরবর্তী জীবনে কী করে নন্দিনী মিত্র হল এবং নন্দরানীতে ফিরে আসার ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করলে রসভঙ্গ হতে পারে। সুতরাং পাঠকের পক্ষে রসভোক্তার মতো রসটুকুই **নহে ফুলহার** উপন্যাস থেকে গ্রহণ করাই উচিত কাজ হবে।

●

অভিমন্যু ঢাক-ঢোলের শিল্পী, মধু দত্ত কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ। ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত এদের জীবনে জড়িয়ে পড়ে শিক্ষিতা মেয়ে জয়তী। পটভূমি খাদ্য আন্দোলনের পথে গ্রাম-বাংলা। বর্তমান গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সমাজের অসাধারণ রূপায়ণ **সুরজিৎ দাশগুপ্তর** সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস **কুরুক্ষেত্র**।

●

আজ আমরা এক তছনছের যুগে বাস করছি। আমাদের এতদিনকার অভ্যস্ত সমাজ-জীবন চোখের সামনে ভেঙে পড়ছে। যেসব রীতি ও নীতিকে আমরা সত্য বলে মানতাম আজ সেগুলির কোনো মূল্য নেই।

**দীপক চৌধুরী** এই ইতিহাসের গতিপথে দাগ কেটে গেছেন।

●

মহাযুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর এক মহাদেশ এশিয়া, তার এক দেশ ভারতবর্ষ, তার এক মহানগর কলকাতা—কলকাতা আর এক মধ্যবিত্ত পরিবারের যুদ্ধ, আগস্ট বিপ্লব, মন্বন্তরের পটভূমিতে তীব্র আবেদনময় কাহিনী **বিমল করের দেওয়াল**। সমসাময়িক মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে আত্মদর্শন ঘটেছে এই সুবৃহৎ উপন্যাসে।

[ সিটিয়াস—৮·০০ / নহে ফুলহার—১৫·০০ / দাগ ( দুই খণ্ড )—৯·০০ / দেওয়াল ( তিন খণ্ড )—২৬·০০ ]

ডি এম লাইব্রেরী ৪২ বিধান সরণী / কলকাতা-৭০০ ০০৬

# শিক্ষিত বেকার

**ভবতোষ দত্ত**

'শিক্ষিত বেকার'দের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে গেলে অনেক প্রশ্ন ওঠে। প্রথমত, কতটা শিক্ষিত হলে কর্মহীনকে শিক্ষিত বেকার বলব? সরকারি পরিসংখ্যানে মাধ্যমিক-পাশ-করা কর্মপ্রার্থী থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং ডাক্তার, ইনজিনীয়র সবার কথাই বলা হয়। হিসাবটা খুব নির্ভরযোগ্য হয় না, কারণ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে পড়তে-পড়তে যদি কেউ এমপ্লয়মেনট একসচেনজের খাতায় নাম লেখায়, তাহলে সে কর্মপ্রার্থী হলেও ঠিক বেকার নয়। এই মূল কথাটা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, বেকার বা কর্মহীন আর কর্মপ্রার্থী সমার্থক নয়। যে কোথাও কাজ করে চলেছে, সেও একটা আরো ভালো কাজের জন্য কর্মপ্রার্থী হিসাবে নাম রেজিসট্রি করতে পারে। তারপর নিজের চেষ্টায় ভালো কাজ পাবার পরেও এমপ্লয়মেনট একসচেনজে সেটা না জানাতে পারে। অর্থাৎ, বর্তমানে ভারতে যে ২৭০ লক্ষ লোকের নাম এমপ্লয়মেনট একসচেনজের খাতায় নথিবদ্ধ আছে, তাদের সবাই একেবারে বেকার নয়। অন্যদিকে, সরকারি খাতায় নাম লেখা নেই, এরকম বেকারের সংখ্যা কয়েক কোটিতে গিয়ে পৌঁছবে। গ্রামের লোকেরা কাছাকাছি এমপ্লয়মেনট একসচেনজে যায় না—আমরা নাম-লেখানো যেসব কর্মপ্রার্থীর হিসাব পাই তারা প্রধানত শহরাঞ্চলের লোক।

বিশদ আলোচনার আগে বেকারের সংজ্ঞা নিয়েই যে সমস্যাগুলি আছে, তার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। আমার যোগ্যতা অনুসারে আমি যা বেতন বা মজুরি দাবি করতে পারি, বা বাজারের বর্তমান অবস্থায় আমার কাজের যে দাম, সেই দামে যদি আমি কাজ করতে রাজি না হই, তাহলে আমার বেকারত্ব স্বেচ্ছামূলক। বেকারদের মধ্যে কেবল তাদেরই ধরা উচিত যারা চলতি মজুরিতেও কাজ পায় না, যাদের বেকারত্ব অনিচ্ছিত ('ইনভলানটারি')। তারপরে প্রশ্ন ওঠে, যদি কেউ বাধ্য হয়ে এমন কাজ নেয় যেটা তার যোগ্যতার সঙ্গে খাপ খায় না, কিংবা চলতি মজুরি বা বেতনের হার থেকে কম মাইনেতে কাজ নিতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে কী বলব? সাধারণত বলা হয় যে, এই শ্রেণীর কর্মরত লোকেদের অবস্থাটা 'প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব' ( 'ডিস্‌গাইজ্‌ড্‌ আন-এমপ্লয়মেনট' )। এরা নিজেরা যে উপার্জনের যোগ্যতা রাখে সেটা পায় না, সমাজ তাদের কাছ থেকে যে উৎপাদিকা শক্তির ব্যবহার আশা করে, তাও পায় না। বি-এ পাশ করে অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসাবে কাজ করছে বা কাজ করতে চাইছে, এরকম খবর আজকাল অনেক পাওয়া যায়।

তারপরে প্রশ্ন ওঠে, সময়ের হিসাবে কতটা কাজ করলে একজন লোককে কর্মহীনের সংজ্ঞা থেকে বার করে আনব? গ্রামের কৃষিশ্রমিকদের অনেকেরই সারা বছর কাজ থাকে না। কৃষিনির্ভর শিল্পে (যেমন চিনি-র কারখানাতে) তো বছরের মাত্র কয়েক মাস পুরোপুরি কাজ হয়। এ সম্বন্ধে একটা আন্তর্জাতিক মান আছে, যেটা আমাদের সরকারও গ্রহণ করেছেন। একজন পূর্ণবয়স্ক লোক যদি ২৭৩ দিন (৩৬৫ দিনের ৭৫ শতাংশ) দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করে, তাহলে এটাকে একটা 'শ্রমিক-বর্ষ' বলে ধরা হবে। এটা হল বছরে ২১৮৪ ঘণ্টার কাজের, বা গড়ে সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা কাজের সমান। আমাদের পরিকল্পনা কমিশন আশা করছেন যে, সপ্তম পরিকল্পনাকালে চার কোটি 'শ্রমিক-বর্ষের' নতুন কাজের সৃষ্টি হবে। যদি এই আকাঙ্ক্ষা সফল হয়, তাহলে এবারেই প্রথম আমাদের দেশের বেকারের মোট সংখ্যায় একটা নীট হ্রাস হবে। এর আগের প্রত্যেক পরিকল্পনাতে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে, কারণ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যতটা বেড়েছে নব-সৃষ্ট কাজের সংখ্যা ততটা বাড়ে নি।

### চাই—২৭৩ লক্ষ শ্রম-দিবস

আসলে কী হচ্ছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায় না। পরিকল্পনা তৈরি হয় 'শ্রমিক-বর্ষ' হিসাব করে, আর, মাঝে-মাঝে পরিসংখ্যান দেওয়া হয় 'শ্রমিক-দিবসে'র অঙ্কে। যখন বলা হয় যে, কোনো রাজ্যে নানা ধরনের দারিদ্র্য-অপনোদনের প্রকল্পের ফলে এক লক্ষ শ্রম-দিবসের কাজ দেওয়া হয়েছে তখন অঙ্কটা ভালোই শোনায়, কিন্তু ২৭৩ লক্ষ শ্রম-দিবসের কাজ দিতে না পারলে এক লক্ষ লোক পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয় না। এ পর্যন্ত যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে চার কোটি শ্রম-বর্ষের কাজ ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে যাবে, তার কোনো আশা নেই। বিশেষত, শিল্পোন্নয়নের হার যদি বছরে ৬ বা ৭ শতাংশের উপরে না ওঠে তাহলে শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন কর্মসৃষ্টি বিশেষ হবে না—বরং নতুন শিল্পে শ্রমিক-নির্ভরতা কমানোর চেষ্টাতে সমস্যা উঠবে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয় তাতে নতুন কাজের একটা হিসাবও থাকে, কিন্তু পুরানো ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে হাজার হাজার বন্ধ-হয়ে-যাওয়া সংস্থা যে কত, সেটার দিকে নজর পড়ে না। বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রেও বন্ধ-হয়ে-যাওয়া-কারখানা, রুগ্ন-শিল্প, স্ট্রাইক, লক-আউটের ফলে কতটা শ্রমবর্ষ বা শ্রম-দিবস নষ্ট হয় তার দিকেও জোর পড়ে না। একমাত্র পশ্চিম-বঙ্গেই ১৯৮৪ সালে স্ট্রাইকের জন্য ২১৭ লক্ষ এবং লক-আউটের জন্য ৭৮ লক্ষ—মোট ২৯৫ লক্ষ শ্রম-দিবস নষ্ট হয়েছিল। এটা ১,০৮,০০০ শ্রম-বর্ষ নষ্ট হওয়ার সমান।

এ পর্যন্ত যা বলা হল সেটা বেকার-সমস্যার সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে—আলাদা করে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা আলোচনা করতে গেলে সামগ্রিক পটভূমিকাটা স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, অশিক্ষিত বেকার (সাধারণ শ্রমজীবী) আর শিক্ষিত বেকার (যে কায়িক পরিশ্রমের কাজে যেতে চায় না)—এদের মধ্যে তফাতটা কোথায়? বেকার বেকারই—তার আয় নেই, তাই তার ব্যয় করবার ক্ষমতাও নেই, তার শিক্ষা কতদূর পর্যন্ত সে প্রশ্ন কেন ওঠে? প্রশ্নটা ওঠে অত্যন্ত সংগত কারণে। এর একটা সামাজিক রূপ আছে—শিক্ষিত বেকারের অধিকাংশ আসে সমাজের উচ্চতর স্তর থেকে—যাদের আমরা "ভদ্রলোক" বলি তাদের মধ্যে থেকে। এই সামাজিক কারণেই শিক্ষিত বেকারের সমস্যা সর্বত্র আলোচিত হয়, কারণ তারা ছড়িয়ে আছে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদেরই আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে। কিন্তু তা ছাড়া আর-একটা বড়ো অর্থনৈতিক দিক আছে। পরিবার এবং সরকারের বহু টাকা ব্যয়ের পরেও যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকটি কাজ না পায়, বা







এমন-কি কাজ পেতে দেরি হয়, তাহলে সেটা দেশের সম্পদের একটা বিরাট অপচয়। মাধ্যমিক-পাশ বেকার ছেলেকে যদি অনেক টাকা খরচ করে আমরা গ্র্যাজুয়েট বেকারে পরিণত করি, তাহলে টাকাটাই খরচ হল, বেকারত্ব কমল না। চার-পাঁচ বছরের জন্য আমরা সমস্যাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখি, কিন্তু সমস্যাটা দূর হয় না। বরং, আকাঙ্ক্ষার সীমা বিস্তৃত হয়, সে আকাঙ্ক্ষা না মিটলে অন্য অনেক সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষের সমস্যাও ওঠে। যদি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করলেই কাজ পাওয়া প্রত্যেকের পক্ষে সুনিশ্চিত হত, তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানা রকমের আন্দোলন অনেকখানি কমে যেত।

দু-তিনটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বেকার, কারো জন্যই বেকার-ভাতার ব্যবস্থা নেই। পশ্চিমবঙ্গে একটা বেকার-ভাতার প্রকল্প চার বছর চালানো হয়েছিল, কিন্তু তাতে সরকারের খরচ বেড়েছে, কোনো সত্যিকার উপকার হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভাতা যোগ্য যুবকের হাতে পৌঁছয় নি, অযোগ্য লোকের হাতে পৌঁছেছে। এটা নিয়ে রাজনৈতিক স্তরেও অনুযোগ উঠেছে। বরং মহারাষ্ট্রে গ্রামাঞ্চলে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে—প্রত্যেক পরিবারে অন্তত একজনের কাজের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা—তার ফল কিছুটা ভালো হয়েছে, কিন্তু সেখানেও বেসরকারি সমীক্ষাতে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেটা ততটা আশাপ্রদ নয়। কয়েক দশক আগেও বেকারের আশ্রয় ছিল যৌথ পরিবার। এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে—বিশেষত শহরে, যেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশি। পরিবারের গলগ্রহ হয়ে থাকার অপমানের চেয়ে শিক্ষিত বেকার চেষ্টা করে ছাত্র পড়িয়ে বা ওইরকম কিছু করে খানিকটা রোজগার করতে। এটাও এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। আর হতাশ হয়ে শিক্ষিত বেকার যদি বে-আইনি উপার্জনের পথে চলে যায় তাহলে সমাজের পক্ষে সেটা শুধু অপচয় নয়, ভীষণ বিপজ্জনক।

### সপ্তম পরিকল্পনার প্রকল্প

সপ্তম পরিকল্পনাতে চার কোটি লোকের বর্ষব্যাপী নতুন কাজের সৃষ্টির আশা করা হচ্ছে। একথা আগেই বলা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের জন্য কী ব্যবস্থা হবে, তার কোনো বিস্তারিত প্রকল্প-সমষ্টি না দেওয়া হলেও, মোটামুটি অবস্থাটা এখন কী এবং পরে কী দাঁড়াবে, সে সম্বন্ধে কিছু তথ্য আর হিসাব আছে। এই হিসাব অনুসারে, প্রবেশিকা এবং তার উপরের স্তরে শিক্ষিত জনসংখ্যা ১৯৮৫ সালে ছিল ৪·৭৭ কোটি, এবং এটা ১৯৯০ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৬·৪৪ কোটিতে। এর মধ্যে সবাই কর্মপ্রার্থী বা বেকার নয়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে ১৯৮৫-তে শিক্ষিত 'কর্মরত' লোকের সংখ্যা ছিল ৩·০৮ কোটি, অর্থাৎ মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার ৬৪·৭ শতাংশ। বাকি ১·৬৯ কোটি প্রবেশিকা বা তার চেয়ে উঁচু স্তরের শিক্ষিত লোক 'কর্মরত' ছিল না। এখানে বলে নেওয়া উচিত যে কর্মরত ('ইকনমিক্যালি অ্যাকটিভ') হলেই যে সবাই বর্ষ-ব্যাপী অর্থকরী কাজে নিযুক্ত থাকবে, যেটা বলা যায় না। কর্মরত লোকদের মধ্যে অনেকেই—কৃষক, ছোটো ব্যবসায়ের মালিক ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে উকিল, ডাক্তার পর্যন্ত—মজুরি বা বেতন নিয়ে কাজ করেন না। এঁরা 'স্বয়ং-নিযুক্ত' এবং পরিসংখ্যানের দিক থেকে কোনো স্বয়ং-নিযুক্ত লোক পুরোপুরি বেকার হয় না—তাকে কর্মরত বলেই দেখানো হয়। ১৯৮৫-র ৩·০৮ কর্মরত ব্যক্তির মধ্যে শতকরা ৭৬ জন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ, ২৩ জন গ্র্যাজুয়েট বা তার উপরের স্তরে শিক্ষিত এবং ১ জন ডিপ্লোমাধারী।

কর্মরত বা কর্মরত নয়—এভাবে হিসাব না করে জাতীয় নমুনা সমীক্ষাতে শিক্ষিত বেকারের যে তথ্য

সংগৃহীত হয়েছিল, তার দিকে তাকালে দেখা যায় যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উপরে-দেওয়া সংখ্যার চেয়ে কম। বত্রিশতম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুসারে সারা ভারতে শিক্ষিত বেকারের (প্রবেশিকা বা তার উপরের স্তরের) সংখ্যা ১৯৮৫ সালে ছিল ৪৭ লক্ষ। আটত্রিশতম সমীক্ষা হিসাব অনুসারে এ সংখ্যাটা আরো কম বলে দেখা যায়—৩৭ লক্ষ। পরিকল্পনা কমিশন বলছেন যে, শিক্ষিত বেকারের অনুপাতটা যদি বাড়তে না দেওয়া হয় তাহলে এদের জন্য ১৯৯০-এর মধ্যে ৯৪ লক্ষ নতুন কাজ সৃষ্টি করতে হবে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর সংখ্যাতে যে বৃদ্ধি হবে তার হিসাবটা দেখলে ভীত হতে হয়। বৃদ্ধি হবে সাধারণ 'আর্ট'স্ গ্র্যাজুয়েট-এর সংখ্যাতে ৬,১৭,০০০, আর্টস্-এ পোসটগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারীর সংখ্যায় ৫,১০,০০০, কমারস গ্র্যাজুয়েট-এর সংখ্যায় ৩,৬৫,০০০, কমার্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যায় ৯৬,০০০, বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যায় ২,০১,০০০, বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যায় ৭০,০০০, ইনজিনীয়ারিং ডিগ্রিধারীদের সংখ্যায় ৮২,০০০, ডাকতারি ডিগ্রিধারীদের সংখ্যায় ৪৩,৭০০, বি-এড ডিগ্রিধারীদের সংখ্যায় ২,৫৬,০০০। এ ছাড়া আছে দন্তচিকিৎসক, নারস্, কৃষিবিজ্ঞানী, পশুচিকিৎসক ইত্যাদি। ইনজিনীয়ারিংএ ডিপ্লোমাধারীর সংখ্যা বাড়বে ১,৭১,০০০—আর মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশের সংখ্যাটা ৩৮২ লক্ষ থেকে বেড়ে হবে ৫২৪ লক্ষ, অর্থাৎ বৃদ্ধি হবে ১৪২ লক্ষ। সব যোগ দিয়ে বৃদ্ধি হবে ১·৭ কোটি। একথা আগেই বলা হয়েছে।

### কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে

সমস্যাটা বিরাট, যদিও এর চেয়েও অনেক বড়ো সমস্যা কাজ করবার উপযোগী বয়সের লোকের সামগ্রিক বৃদ্ধি, এবং তাদের মধ্যে বেকারত্ব। এর অধিকাংশ হিসাব অনেক রকমের শর্ত ধরে নিয়ে করা হয়েছে, এবং সর্বত্র একই সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয় নি। এবারে এমপ্লয়মেনট-একসচেনজে-নাম-লেখানো কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যাটা দেখা যাক। ১৯৮৫-৮৬-র শেষে, অর্থাৎ মার্চ ১৯৮৬ তে এই সংখ্যাটা ছিল দুই কোটি সত্তর লক্ষ। সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে—তার কারণ একদিকে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অন্যদিকে নতুন কাজের ব্যবস্থা করতে এমপ্লয়মেনট একসচেনজের অসাফল্য। যেমন, ১৯৮৬-র মার্চ মাসে নতুন নাম রেজিসট্রি করা হয়েছিল ৩,৫৭,০০০, কিন্তু একসচেনজ-এর মাধ্যমে কাজ পেয়েছিলেন মাত্র ২৭,০০০। অর্থাৎ একমাসেই মোট নামলেখানো কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৩,৩০,০০০ বেড়ে গেল। অবশ্য, অন্যদিকে প্রত্যেক মাসেই নবীকরণ না করাতে কিছু নাম খাতা থেকে কেটে দেওয়া হয়। সারা ভারতে ২৭০ লক্ষ নামলেখানো কর্মপ্রার্থীর মধ্যে প্রায় ৪৫ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা সারা ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ, কিন্তু নামলেখানো কর্মপ্রার্থীর সর্বভারতীয় সংখ্যাতে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ১৭ শতাংশ। কলকাতার আশেপাশে অন্যান্য শহরে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক। তা ছাড়া, বেকার-ভাতার ব্যবস্থা চলতে থাকবে, এই মনে করেও হয়তো অনেকে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু, সবচেয়ে বড়ো কথা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের মন্দগতি। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫—এই দশ বছরে শিল্পোৎপাদনের সূচী সারা ভারতে বেড়েছে ৭০ শতাংশ, আর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ২০ শতাংশ। শিল্পোৎপাদনের গতি শ্লথ হলে পরিবহণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অনেক দিকে শ্রমনিয়োগ ব্যাহত হয়।

১৯৮৫-র মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেনট একসচেনজে নামলেখানো কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪১ লক্ষ। তার মধ্যে শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী ছিল অর্ধেক-এরও বেশি—প্রায় ২১ লক্ষ। এর মধ্যে মাধ্যমিক-পাশ-করা ছিল ১০·২ লক্ষ, 'আনডার গ্র্যাজুয়েট' ও ইনজিনীয়ারিং-এর ডিপ্লোমাধারী ছিল ৬·৯ লক্ষ, ইনজিনীয়ারিং-এর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ছিল ১৪০০, ডিগ্রি-পাওয়া ডাকতার কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২০০০, আর অন্য সবধরনের গ্র্যাজুয়েট বা তদূর্ধ্ব উপাধিধারীর সংখ্যা ছিল ৩·৯ লক্ষ। ডিগ্রিধারী ইনজিনীয়ারদের মধ্যে যাঁরাই সুযোগ পান তাঁরা দেশের বাইরে চলে যান—ভারতবাসী করদাতার টাকায় শিক্ষিত হয়ে বিদেশের উৎপাদনবৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। অন্যদিকে নামলেখানো সব ইনজিনীয়ারই বেকার নন—তাঁরা একটা কাজ থেকে আরো ভালো একটা কাজে যেতে চান। ডাকতাররা কখনোই ঠিক বেকার হন না—কারণ ডিগ্রি এবং লাইসেনস পাবার পর থেকেই তাঁরা প্র্যাকটিসে নামতে পারেন। যে দুই হাজার ডাকতারের নাম এমপ্লয়মেনট একসচেনজের খাতাতে আছে তাঁরা হয়তো প্র্যাকটিস ছেড়ে চাকরি করতে চান এবং তাঁরা খুব ভালো কাজ পেলেই সেটা নেবেন। কেউ-কেউ হয়তো গ্রামাঞ্চলের কাজ ছেড়ে শহরে আসতে চান। একজন ইনজিনীয়ার বা ডাকতার তৈরি করতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে হবে। যদি দেশের বাইরে না চলে যান, তাহলে এঁরা ঠিক বেকার থাকবেন না।

### ব্যর্থতা ঠিক কোথায়?

সমস্যা অন্যদের নিয়ে। মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক যারা পাশ করে তাদের সবাই কলেজে ঢুকতে পারে না, বি.এ. পাশ যারা করে তারা সবাই এম.এ. পড়তে সুযোগ পায় না। আর যারা সুযোগ পায় তাদের ক্ষেত্রেও বেকারত্বের দিনগুলি কয়েক বছর পিছিয়ে যায় মাত্র এবং ইতিমধ্যে তাদের জন্যও বহু অর্থ ব্যয়িত হয়ে যায়। সর্বস্তরে পাঠক্রম যদি কিছুটা কর্মমুখী করে আনা যায় তাহলে হয়তো পাশকরা ছাত্রদের জন্য চাহিদা কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু একথা আবার এখানে বলা প্রয়োজন যে, দেশের ও রাজ্যের মোট উৎপাদনে কাম্যহারে গতিসঞ্চার না হলে নিয়োগের জন্য চাহিদা বাড়বে না। আর্থিক উন্নয়নের প্রকল্প এবং শিক্ষাপ্রসারের প্রকল্প যদি একযোগে অগ্রসর না হয়, এবং জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে (বছরে ২·২৪ শতাংশ) বাড়তে থাকে, তাহলে আমাদের বেকার-সমস্যার কোনো সমাধান নেই—সামগ্রিকভাবে নেই, শিক্ষিত বেকারের ক্ষেত্রেও নেই।

উপসংহারে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাকে কর্মমুখী করা ('ওয়ার্ক এডুকেশন' আর) শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করা ('ভোকেশন্যাল এডুকেশন') ঠিক এক জিনিস নয়। সব ছাত্রকে—বিশেষ করে স্কুল-স্তরে—কিছুটা হাতের কাজ শিখতে হবে, এটা খুবই কাম্য। কিন্তু এই কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রের যেটুকু এবং যে ধরনের দক্ষতা বাড়ানো হল, পরবর্তী কালে যে ঠিক তারই জন্য চাহিদা থাকবে সেটা আগে থেকে বলা যায় না, যদি না একটা দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা এর পিছনে থাকে। বৃত্তিমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা। এখানেও কোন্ বৃত্তিতে ভবিষ্যতে চাহিদা বাড়বে তার একটা সুচিন্তিত চিত্র আগে থেকে তৈরি না করতে পারলে, ছাত্ররা বিশেষ কোনো একটা বৃত্তি শিখে পরে হয়তো দেখবে তাদের অর্জিত দক্ষতার বাজারে কোন মূল্য নেই। এটা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সুতা-কাটা বা তাঁত-চালানোর ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রেও হতে পারে, কারণ সেখানে প্রযুক্তিগত উন্নতি খুবই দ্রুত—পাঁচ বছর আগে যা শেখানো হয়েছে পরে সেটা কালাতিক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। 'ভোকেশনাইজেশন' কথাটা খুব গালভরা, কিন্তু এটা সার্থক হবে তখনই যখন উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদির যথা-প্রয়োজন হারে বৃদ্ধির একটা সুসংহত পরিকল্পনা থাকে, এবং সেই পরিকল্পনা যথাযথ কালক্রম অনুসারে রূপায়িত হয়। এখানেই আমাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। পরিকল্পনা বাদ দিয়ে "বাজারের শক্তি"-র উপরে সব ছেড়ে দিলে শ্রমনিয়োগের সমস্যা আরো গুরুতর হবে। আমাদের প্রয়োজন সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং তার সুষ্ঠু রূপায়ণ।

## বিচ্ছেদের পর

( প্যালেস্তাইনের কবি আবু-সালমা অবলম্বনে )

**কৃষ্ণ ধর**

প্রশ্ন কোরো না তুমি, আমি বলে বোঝাতে পারব না
কী আমার বিচ্ছেদবেদনা, প্রিয় স্বদেশ আর প্রিয়জনের জন্য,
যতবার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বিদ্যুৎসংকেত দেখি
বুক ভেঙে যায় আমার, আমার সাহস গলে যায়।

প্রসারিত প্রান্তরের ওপর দিয়ে সমুদ্রতরঙ্গের মতো
আমরা চলে এসেছিলুম বিতাড়িত হয়ে
ছড়িয়ে পড়েছিলুম আকাশে ভাসমান মেঘপুঞ্জের মতো
আমার প্রিয় মাতৃভূমি, তোমার জন্য ভালোবাসায় ও প্রতীক্ষায়
সহ্য করেছি কত দুঃখ নির্যাতন!

যদি জানতে চাও, আমরা কোথাকার?
উত্তর পাবে একটাই, আমরা শুধু তোমারই চিরকালের!
তোমার মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি বলে
তোমার মাটি আরও নিবিড়ভাবে টানে আমাদের।

দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছি আমাদের আকাঙ্ক্ষার বীজ
তা থেকে যাতে একদিন গজাতে পারে তীক্ষ্ণ তীর আর বর্শা
তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন আজ আমরা
কিন্তু তুমি বেঁচে আছ আমাদের হৃদয়ে বছরের পর বছর
আমাদের অপমানে, নির্বাসনে, দুঃখবেদনায়।

আমরা আবার ফিরে আসব তোমার আঙিনায়
কেউ বয়সে প্রবীণ, কেউ এখনো তরুণ
আমরা এসে নতজানু হয়ে চুম্বন করব তোমার পাহাড়-পাথর
তোমার মরুধূলি, তোমার সমুদ্র-উপল, তোমার মাটি!



## তরু দত্ত

**তরুণ সান্যাল**

শাপলা রাতে খুলে ধরেছে শাদা পেয়ালার শূন্যতাকে
চাঁদ তার বুক ভরাবে,
বা জ্যোৎস্নায় জটাজুট বট
মাটিতে গভীর পোঁতা পা উপড়িয়ে আকাশে উড়াল হতে চায়,
স্বদেশে বিদেশী সেই একাকিনী অপরাজিতার বাঙলা নীল নিংড়ে
ভরে তুলেছে ঘট কিংবা পট,
যাকে সে জীবন জানত
যে জীবন বড়ো ঘন যেন ট্রপিকাল বৃষ্টিবন
অথচ কেবলই মনে হত আঁকা দৃশ্যপটে দুদণ্ড অপেরা,
এবং ভরাট খাদে গলা কার জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠা সোপ্রানোর লতা
একা-একা গেলাস বাতির নীচে সাজঘরে ঘসে তুলছে
রানি-রানি মুখের আদল,
যেন হারেমের রাজ্ঞী আয়নার সম্মুখে ত্রস্ত
হঠাৎই জরার রেখাপাতে।

তরুণী
তোমার কাছে অন্য চোরা ঢেউগুলি একটু-একটু করে
হাওয়া বেড়ে ওঠার সঙ্গে ফুলে-ফুলে উঠেছিল তরঙ্গফণায় নাচবে বলে
রোদ বেড়ে ওঠার সঙ্গে পায়ে-পায়ে আহ্লাদী বেড়াল হয়ে
ছায়া-ছায়া মৃত্যু ঘুরেছিল,
অথচ তখনি খুলে যাচ্ছিল শাপলার মতো, শাদা পেয়ালায়,
দীর্ঘ স্বপ্নাতুর চোখ কাঁধে ঝুমকো চুল স্কার্টে ঈষৎ বুকের ভাঁজে
নারী হয়ে ওঠা

কোনো অর্ফিয়ুস তাকে ফেরায় নি ভেজা ভোগবতী মাটি থেকে
কোনো দূত দেবতার পায়ে বাঁধা ডানাও ছিল না
যোগাদ্য দেবীর শাঁখা-পরা হাতে তুলে দিয়ে প্রভাঁসের ফুল
নোয়ানো কঞ্চির জাফরি আলো খেলিয়ে বৃষ্টিশেষে
একঝাঁক পুঁটির রুপো উলটেপালটে দেখেছিল নিজেরই মুখশ্রী পুষ্করিণী
তারপর ফিরে যাওয়া নোনা পুকুরে নির্ভেজাল ঘুমে

ভোরের পাখিটি হয়ে বিহারীলালের সঙ্গে তরু দত্ত শম মেলাতে পারে?
রবীন্দ্রনাথেরও কেন মনে হয় নি? ভাষা কী বিবাদী?
নাকি তরু ছিল এক দেশান্তরী মরশুমী, যে পাখি
ঠিকই শীতে বিলে-ঝিলে স্বদেশী বন্ধুকে চিনি,
ঘুড়ি উড়িয়ে বঁড়শি বিঁধে মাটিতে নামানো যাকে
নলখাগড়া বা পানাপুকুর থেকে খুঁজে আনে বশংবদ রিট্রিভার ডগ॥





## মানচিত্র

মুর্তজা বশীর

হঠাৎ দেখে মনে হল সদ্য ক্রুশ থেকে নেমে যিশু
এই মাত্তর শুয়েছে সঙ্কুচিত মরচে শরীরে
ঠাণ্ডা মর্গের বিবরে—যেন এক বহু পুরাতন
মানচিত্র, সেলোফেন ছিঁড়ে উঠে গেছে ভাঁজে-ভাঁজে।
সাদা মার্বেল টেবিলে ঝাঁঝরা দুহাত দুই পাশে
কাক-তাড়ুয়ার মতো খড়কুটো শিরা-মহাশিরা
বাজপড়া তালগাছ শব-ব্যবচ্ছেদে মাংসপেশী,
চর্মসার দোমড়ানো আঙ্গুল গুমরানো যন্ত্রণায়
শেষ নিঃশ্বাসে চেয়েছে অবলুপ্ত মনে শেষ পুঁজি:
কুসুম-কুসুম স্পর্শ নিয়ে প্রিয়তমার অধর।
একটু হেলানো মাথা অন্তরিত প্রবল পিপাসা
নিয়ে দেখে আছে কিনা একান্তে দাঁড়িয়ে স্তবকিত
রজনীগন্ধার মতো কেউ প্রতীক্ষিত পদশব্দে।
নতুন চাঁদের মতো আধচেরা চোখের ফাটল—
যেন গভীর সুড়ঙ্গ হয়ে আছে দিগন্তপ্রসারী
নক্ষত্রবিহীন রাত, দিশেহারা জর্জর বাতাস
নেই উজান-ভাটিতে—যেখানে নিঃশব্দে মাছরাঙা
ক্লান্ত ডানা বন্ধ করে ঘুমঘোর বুনোঝোপে একা।
ভেজা দুটি ঠোঁট জনশূন্য তীরভূমি ঘেঁষে মৃত
এক সামুদ্রিক মাছ গরম বালিতে ঝলসানো,
সাগরের নোনা স্বাদ তখনো জিভের আস্বাদনে—
বক্ষপিঞ্জর উন্মুক্ত বন্ধ জানালার খড়খড়ি

## দগ্ধ রজস্বলা

**রবীন সুর**

ঝুমরিতিলাইয়ার কাছাকাছি মাইলস্টোনে জানলুম
রজৌলি আর আটাশ কিলোমিটার।
যখন কুমারী ছিলে আটাশ সংখ্যাটি আমাদের কাছে
আতঙ্ক আহ্লাদ চিহ্নে কতবার তোলপাড় করেছে—
রজস্বলা ধুলো উড়ছে যতদূর দৃষ্টি যায় পরাগসংশ্লেষে।
নিষিদ্ধসঙ্গমশেষে, মনে আছে, পেঁজা-পেঁজা তুলোর শিমুল
অহোরাত্র তুমি শুধু উড়েছিলে চোখ চুল নাভি পা—
শিহরিত শিরদাঁড়ার সব কশেরুকা একে একে খুলে?

এখানে পাহাড়ি বন আঁকাবাঁকা পাকদণ্ডী চড়াই উতরাই,
ভূগোলের পাতা জুড়ে মানচিত্র প্রত্নদলিলের নির্ভুল হিসেব—
বুনোগন্ধ আদিমতা মরে গেছে নিয়ত পাথরকাটা যন্ত্রসভ্যতায়,
কুঠার-কঠোর শহরের দাঁত টুঁটি ধরে গা-ঢাকা দিয়েছে,
শুধু ডিজেলের পোড়া হাওয়া করাতকলের গুঁড়ো, সিগারেট, মদ।

পাথরে বন্ধক নদী, চড়া সুদ, ক্রমশ তামাদি স্থির জল
বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে মুখ নীচু করে:
না বিদ্যুৎ না সেচ শত সেমিনার দিস্তে-দিস্তে কাগজ ফাঁপিয়ে,
কালকূট দূষণের পরিণামে জলের সমস্ত শস্য ব্যর্থ বরবাদ।

হাজারিবাগের বনে বাঘ নেই,
অবশ্য মানুষ-বাঘ ওত পেতে আছে;
মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত খাবে বলে।
চতুর্দিকে অরণ্যনিধনযজ্ঞ, বনমন্ত্রী প্রধান উদ্যোগী পুরোহিত;
ছেঁড়া-ছায়া গাছতলায় কেউ নেই মানুষের অসভ্যতা ছাড়া!

মায়ের কোলের শিশু যতক্ষণ যথাস্থানে ছিল
তখনই সুন্দর। বন থেকে উপড়ে আনা রক্তহীন কাঠ
কদাকার সুনিপুণ বার্নিশের মেকি চেকনাই, র‍্যাঁদার পালিশে
ঘর-আলো-করা রাত-জাগা গণিকার আসবাব-জেল্লা।
পাখির পালক নেই, কাদাখোঁচা, অষ্টাবক্র কিম্ভূতকিমাকার—
ডুয়ার্স শুকিয়ে যাচ্ছে, তরাই-এর চতুর্দিকে খরার লক্‌লকে জিব।



## হানটাপতির শেষ পরাজয়

**শতদ্রু মজুমদার**

সরস্বতী নদীর পোলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হানটা ভাবে, যে করেই হোক আজ মরে যাওয়া দরকার—আমার বোধহয় বেঁচে থাকাটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না—

পোলের দুধারে আধমানুষসমান সিমেনটের রেলিঙ। রেলিঙে বুক চেপে সে নীচের দিকে তাকিয়ে।

জলে আড়াআড়ি নৌকো দাঁড় করিয়ে একজন মাছ ধরছিল। লোকটার নাম জনার্দন। দুলেপাড়ায় থাকে। আসলে ঘরামি। কাজ না থাকলে এইসব। গরমেনটের নদী। কেউ কিছু বলবে না। একসময় হানটাও ছিপ ফেলেছে। শামুকের টোপে এনতার বাগদা চিড়ি ধরত ঘোর বর্ষায়। নৌকোর সঙ্গে বাঁশের খুঁটিতে আটকানো তেকোনা জালটা। শরীরের ভর দিয়ে জাল ওঠাল জনার্দন। দু-চারটে চুনো-চানা তুলে ঝপাং করে ফেলে দিল আবার। তারপর ওপর-মুখো হয়ে বলল, 'কী হানটা, খবর কী?' খবর তো অনেক। সবাইকে তো আর সব বলা যায় না। তবে পরশুদিন দু-নম্বর বউটা পালিয়ে গেল। এটাই জনার্দন শুনতে চায় নিশ্চয়ই।

হানটা বলল, 'ভালো—'

নৌকোর পাটাতনে লুঙ্গি গুটিয়ে বসল জনার্দন। বিড়ি ধরাল একটা।

ভাঁটার টানে জল গড়িমসি। মাছ জমা হতে সময় লাগবে। চুপচাপ আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? হানটার সঙ্গে তাই একটু গল্পগুজব।

'বেশ—তা কবে ফের বে করচো?'

এটা যে বলবে, জানা কথাই। হানটা চুপ।

জনার্দন জুড়ে দিল, 'কটা হলো থালে এই নিয়ে? হিসেবটা রেকো কিন্তুক। পরে কাজ দেবে।'

দূর থেকে একটা মাঝি চিৎকার ছাড়ে, 'হো-ই-ই—'

জনার্দন ব্যস্ত হয়ে পড়ে বাঁধন খুলে নৌকো সরাতে।

সেই ফাঁকে জবাব না দিয়েই হানটা পা চালাল।

বেলা দশটা সময়। পথে-ঘাটে লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। হুশহাশ সাইকেল-রিকশা আসছে যাচ্ছে।

যেতে-যেতে একদল স্কুলের ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, 'কিরে হানটা, তোর বউ কোথায়?'

অন্যদিন হলে অনেক কিছুই বলতে পারত। কিন্তু আজ দুপুরের পর তো আর সে থাকছে না। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী! রাজার মাঠের ওপর দিয়ে ছেলেরা চলে গেল।

ক বছর আগেও হানটা ওদের সঙ্গে ডানডাগুলি, গোবরড্যাং খেলেছে। ফুল প্যানট ধরতে কেউ আর পাত্তা দেয় না। কিন্তু খ্যাপায়। আজকাল বউ নিয়ে রগড়টা যেন বড্ড বেশি। পরেরটা সটকে পড়ার পর হানটা বুঝল, বিয়ে করাটা ঠিক হচ্ছে না। সেইসঙ্গে বেঁচে থাকাটাও না। তা চটক একটু ছিল সন্ধ্যার। ঢাউশ খোঁপা বেঁধে কুঁচি দিয়ে-দিয়ে শাড়ি পরলে একেবারে বাঙলা বইয়ের হিরোয়িন। কে জানত, বুড়ো-হাবড়া মহাদেবের সঙ্গে মজবে! তাতেও খুব একটা ক্ষতি ছিল না। মহাদেব চেনা মানুষ। এক-সঙ্গে পানবরজে কাজ করেছে। এখন নয় তেলেভাজার দোকান করে মহাদেব বাবু হয়েছে, তাহলেও হানটার যে বন্ধুজন এটা তো আর বুজরুকি নয়! সব ঠিক আছে। কিন্তু পরের বউকে ভাগিয়ে নেয়াটা কী ন্যায্য হল?

কথাটা জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। মুশকিল হল, মহাদেব যদি বলে বসে, তোর বউ আমার কাছে চলে এসেছে। তাহলে? দোষীটা যে ঠিক কে, জানা যাবে না। তার চেয়ে থাক। যে গেছে, গেছে। যখন এ জীবন আর রাখবে না বলে ঠিকই করে ফেলেছে, বউ-ফউ নিয়ে ভেবেই বা লাভ কী!

ক্ষেত্র সাহার চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতর থেকে কে যেন চ্যাঁচাল, 'এই হানটা শোন্—শোন্—' উঁকি মেরে দেখে, ভৈরব মাল।

হানটা বলল, 'কেন, কী—'

'আরে শোন্ না—ভেতরে আসতে দোষ কী?'

যাব কি যাব না করতে-করতে হানটা দোকানে ঢুকল। ডজন-খানেক লোকে ঠাসাঠাসি ঘুপচিঘরটা। কেউ দোকানি, কেউ রিকশাওলা। হাতে-হাতে চায়ের গ্লাস।

'আয়, বোস—'

তাকে পাশে বসিয়ে আধখানা পাঁউরুটি মুখে ঠেসতে লাগল ভৈরব। চ্যাঁচাড়িতে লটকানো সিনেমার পোসটার। সেদিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল হানটা।

মুখের খাদ্য পেটে চালান করে ভৈরব বলল, 'একটা গাড়ি আছে, চালাবি?'

'না। অসুবিধা আছে।'

'আরে সকালে—আমিই কাজ করচি। বিকেলের দিকে যদি তুই খাটতে পারিস—'

আবার সেই ফ্যাচাঙ। রোজ সকালে রাজগঞ্জ থেকে ভ্যানভরতি কাঁচা আনাজ বয়ে আনে ভৈরব। বিকেলের দিকে অন্যকে দিয়ে খাটাবে। যা বলবে, দেবে না। এরকম আগেও হয়েছে। লোক চেনা। গাছ-ফেরেববাজ। সে যাই হোক—।

'না, আমি কাজ করব না—অসুবিধা আছে।' হানটার সেই একই কথা।

চলে যাচ্ছিল সে। খপ করে হাতটা ধরে টান মারল ভৈরব, 'আরে দু-টাকা রোজ পাবি।'

'না। হবে না।'

'যাঃ শালা তবে', ভৈরব গলাধাক্কা দিল।

মুখ ব্যাজার করে বেরিয়ে গেল হানটা।

বলতে গেলে ভ্যান-চালানো কাজটা খারাপ নয়। অন্ধকার থাকতে উঠতে হয়। অন্ধকার হওয়া অব্দি খেটে যেতে পারলে পয়সা আছে। শরীরে দেয় না এখন। পঁয়তিরিশেই হানটা বুড়ো। আর মেজদা মনটা চল্লিশ বয়সে এখনো ব্যায়াম সমিতিতে লোহার রড বাঁকায়। আরজি পার্টির সেক্রেটারি। ফি-বছর পুজোয় চ্যাংড়াদের সঙ্গে পাড়ায় নাটক করে।

কিন্তু রোজগার বিদ্যেবুদ্ধি চেহারা সব হানটাকে







থাবড়ে বসিয়ে দিয়েছে এক জায়গায়। বড়ো আর হল না কোনদিন। মানুষও না।

বেলা গড়িয়েছে বেশ। স্কুলের ছেলেমেয়েদের আর দেখা যাচ্ছে না। এগারোটার মধ্যে র‍্যাশন দোকানে না গেলে হবে না। ওবেলার তো কথাই আসে না। তাও যেত না। কাকামণি অনেক করে বলেছেন সকালে। কী খেয়ালে রাজি হয়ে গেল। তবে আজই শেষ। বলে দেবে, আর হবে না।

মিত্তিরদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হানটা তিনবার কড়া নাড়ল। দরজা খুলে গটমট বেরিয়ে গেল দেবা। অফিসে যাচ্ছে। ওপরের বারান্দায় দেবার বউ। কোলে বাচ্চা। হাসি-হাসি মুখ।

কী ঘটা করে দেবার বিয়ে হল!

কতদিন দুপুরে দেবাকে কোকিল ডেকে বাড়ি থেকে বার করেছে সে। বড়োপুকুরে সাঁতার শিখিয়েছে। কালীপুজোর সময় তুবড়ি ঠেসেছে একসঙ্গে। সেই দেবার বিয়েতে হানটা কলাপাতা ফেলল।

'কিরে এত দেরি করলি কেন? একটু তাড়াতাড়ি আসিস, বাবা। চিনি নেই একদম।'

র‍্যাশন কার্ড আর ব্যাগ দিয়ে দেবার মা দরজা বন্ধ করে দিল। হানটা তখন নিজের পথে।

চিনি আর কেরোসিনটা তুলে দিয়ে চাল-গমটা হানটা নেয়। সোজা বাণীপুরে বিক্রি করে আসে। কেজিতে আট আনা করে থাকে। চালে একটু বেশি লাভ। তবে দাম বাড়তে অনেকেই চাল তোলে।

এরকম আট-দশটা বাড়ি ছিল। ফালতু সন্দেহ করে দু-চারজন ছাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক বাড়িতে এমনিই তোলায় না। কিন্তু বাবা পঞ্চাননের পায়ে হাত রেখে হানটা বলতে পারবে, ও চোর নয়।

গির্জাতলার মোড় পেরোতেই গোবিন্দ চলে গেল। কে বলবে, হানটার ভাই! গোবিন্দটা রাস্তাঘাটে কথা বলে না। তাকায় না ফিরে। করাতকলে কাজ পেয়েছে। বিয়েও করবে নাকি। মেয়ে নিজেই ঠিক করে রেখেছে। তুলসী ধাড়ার ছোটোটা। বয়সে গোবিন্দর বড়োই হবে। এখনো হাঁটুর ওপর ফ্রক পরে। রথতলার বাজারে বাপের পাশে বসে পাল্লা ধরে সেই মেয়ে। হাজার মানুষের সঙ্গে হাসি-মশকরা। চলাচলি। স্বভাব-চরিত্তির ভালো নয় মোটেই। গোবিন্দর সঙ্গে কথা-বলাবলি থাকলে বলতে পারত, ও মেয়েকে তুই বিয়ে করিস নি। কথাটা বলা হবে না আর।

র‍্যাশন তুলে ফিরতে-ফিরতে বারোটা বেজে গেল। চিনি ছাড়া আর কিছু তোলে নি আজ। খালি হাতে দেখে দেবার মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিরে, তুই কিছু নিস নি কেন?' হানটা বলেছে, 'এমনি।'

কী খেয়ালে আট আনা পয়সা দিল।

দেবার মা-টা তবু ভালো। বউটা যেন কেমন! সে কি জানে, হানটা তার বরের বন্ধু ছিল! দেবা বলে নি নিশ্চয়ই। বলবে কেন? হানটা পাগল। সবাই খ্যাপায়। খালি-খালি বিয়ে করে।

বারোয়ারি মাঠের ধারে ছেলে-ছোকরাদের ভিড় দেখে হানটা দাঁড়াল একটু। নালার ধারে জড়ো হয়েছে সব। ছেলেগুলো এক্ষুনি পেছনে লাগতে পারে। কাছাকাছি আসতেই শুনল, 'পারবে নাকি আমার সঙ্গে? একবার ক্ষমতা পাই সব শালাকে দেখে নেবো—' মুখটা বাড়াল একটু। নালার ভেতরে জেবে মাতাল। আধশোয়া অবস্থায়। কপাল বেয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। ড্রেনের ঘোলাটে জলে লালচে আভা। ছেলেগুলো ফিকফিক হাসছে। কাঠির থোঁচা দিয়ে মজা লুটছে দেদার। মাতালের যাচ্ছেতাই খিস্তি।

তবে হানটার মনে হয়, জেবে ছেলে খারাপ নয়। মৌড়িগ্রাম স্টেশনে ভাস্করলবণ বিক্রি করে। যখন ফেরে, গলা অব্দি। জেবে বড়ো দুঃখী। বোধহয় ভুলতে চায় সব। হানটার ইচ্ছে করে, জেবেকে তুলে বসাতে। দুঃখটা ভাগাভাগি করে নিতে। কিন্তু তাহলে ওকেও মেরে নালায় শুইয়ে দেবে। কেউ ধরতে আসবে না।

জেবেকে যেমন কেউ ধরতে আসে নি। একবার দেখেই চলে যাচ্ছিল হানটা। পেছন থেকে একসঙ্গে নামতা পড়ার মতো চেঁচিয়ে উঠল সবাই :

হানটাপতি সরস্বতী কাল হানটার বিয়ে
হানটা যাবে শ্বশুরবাড়ি কালীতলা দিয়ে।

আর ফিরে তাকায় না সে। বলুক। বলে নিক যত খুশি।

সময়টা নেহাত খারাপ যাচ্ছে। বিপদ-আপদ কখন, কোথা দিয়ে যে চলে আসে বলা যায় না।

এই তো সেদিন। বোসেদের একটা বাচ্চা ওকে খেপাচ্ছিল। তাড়া করতেই আঁশফলতলায় পড়ে গেল। ছেলেটার বাবা ওপর থেকে নেমে এসে কী মার না মেরেছিল! চুপচাপ যে থাকবে, সে জো নেই। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে খেপিয়ে তুলবে।

আসলে গলদ একটা জায়গায় আছে। পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত হানটা তার হাঁটুর বয়সীদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে বেড়িয়েছে। লম্বায় সাড়ে চার ফুট। বারো-তেরো বছরের ছেলেদের মতো। বুদ্ধিও সেইরকম। ওই-টুকু টুকু ছেলেরাই বন্ধু। কিন্তু বেশি দিন থাকে না। মাথা ঝাড়া দিলেই সব পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তখন আবার জুটিয়ে নেয় ছোটো-ছোটোদের। আগান-বাগান দৌড়-ঝাঁপ। বড়োপুকুরে বাতাবিলেবু নিয়ে বল খেলা। বর্ষায় সরস্বতী নদীতে ভেলায় করে ভেসে বেড়ানো। এইসব করতে-করতে ছেলেরা কখন যে বড়ো হয়ে যায় হানটা টের পায় না।

একসময় দেখা গেল, থুতনিতে কচুরিপানার চুলের মতো দাড়ি। পায়ের গোছ ফুলো-ফুলো। হানটা জানল, তার বয়স হয়েছে। তখনো সে হাফ-প্যানট পরে, ঠাট্টা-ইয়ারকিতে কাটিয়ে দিতে চাইছিল।

মা বললে, 'কদিন আর বসে-বসে খাবি—রুজি-রোজগারের চেষ্টা কর এবার।'

খাটালে ভাড়া থাকে জেবে। হানটা সব বলল গিয়ে। তা জেবে একটা মতলব দিয়েছিল।

সেইমতো, সামনে-কাচ-লাগানো ডালডার টিন কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ট্রেনে-ট্রেনে ঝাল-মুড়ি বিক্রি করত হানটা। পাড়ার চেনাজানা ছেলেরা মুড়ি খেয়ে পয়সা দেয়নি কত। ট্রেনে হকারি করতে-করতে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। সে পারুল। ধূপকাঠি বিক্রি করত। মুশকিল হল, পারুল মাথায় একটু ঢ্যাঙা। তাতে আটকায় নি। পঞ্চাননতলা থেকে সিঁদুর পরে এল একদিন। একটা শাড়ি দিয়েছিল মা। চলছিল মন্দ না। শুধু একটা ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিল পারুল, 'ওই টুকু-টু-কু ছেলেরা তোমায় তুই-তুকারি করে কেন?' আসল কারণটা তো আর বলা যায় না!

'ও এমনি' বলে উড়িয়ে দিয়েছিল হানটা।

একদিন দেখল, পারুল সুটকেশ গোছগাছ করছে। কী, না বাপের বাড়ি যাবে। দাদার অসুখ। খবর এসেছে। একাই চলে গেল পারুল। গেল, আর এল না।

পরে একদিন ট্রেনে দেখা। মাথার সিঁদুর তুলে কালীপদ পাঠকের চন্দন ধূপ-বিক্রি করছে।

খুব দুঃখ পেয়েছিল হানটা। সেই দুঃখে হকারি ছেড়ে ভ্যান-রিকশা টানতে লাগল।

বারোয়ারি মাঠ পেরোলেই বোসেদের দেউড়ি। এটাই হানটার যাওয়া-আসার পথ। আগডুম-বাগডুম যা জিগ্যেস করার, করে ফেলেছে বোসেদের মেয়ে-বউরা। আর কিছু জানার নেই। এইসব ভেবে সে নিশ্চিন্তে পা চালায়।

ভেতর-পুকুরধার বরাবর ফালি রাস্তা। দুপাশে ঝোপঝাড়, লতাপাতা। পুকুরের এপাড় থেকে হানটা দেখল, বুড়ো বাপটা ধিকিধিকি আসছে। সামনা-সামনি হতেই দাঁড়াল বুক টান করে। লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কে, হানটা নাকি?'

হানটা বলল, 'হ্যাঁ।'

'বলছিলুম কী, দশটা পয়সা হবে তোর কাছে?







ওবেলাই দিয়ে দোব।' বড়ো ভুলো মন বাবার। মনে থাকে না কিছুই। এর আগেও অনেক নিয়েছে। ফেরত দেয় নি আর। বিলকুল ভুলে মেরে দিয়েছে। পরের দিন ফের একই কথা। কোনো উচ্চবাচ্য করে না হানটা। থাকলে হানটা দেয়। না থাকলে না।

হানটা বলল, 'খুচরো নেই। এই আছুলিটা রাখো।'

'ও বেলাই পেয়ে যাবি।'

হাসি-হাসি মুখ করে বাবা চলে গেল। হেঁটে-হেঁটে দাসপাড়ায় যেতে হয়। বড়দার বাড়ি। সেখানে দুপুরের খাওয়াটা জোটে। বউদি খাটায় খুব। যা-তা বলে। তবু যায়। বাবাকে দেখার কেউ নেই। মা মারা যেতেই সব কেটে পড়ল। মেজদা গোবিন্দকে নিয়েছে। পাশের ঘরে মেজদা থাকে। হানটার দিকে ফিরে তাকাতে বয়ে গেছে।

বাবার জন্যে হানটার দুঃখ হয় খুব। জয়দেবের পানের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একটা করে বিড়ি দেয়। আজ আর বিড়ির জন্যে দাঁড়াতে হবে না বাবাকে, ভাবতে ভালো লাগে।

বেলা হয়েছে বেশ। সারা বাড়ি চুপচাপ। ছেলে-মেয়েরা যে যার স্কুলে। মেজদার ঘরের দরজা বন্ধ। বউদি খিল এঁটে শুয়ে পড়েছে নির্ঘাত।

শেকল খুলে ঘরে ঢুকল হানটা। জামাটা খুলে চিতপটাঙ শুয়ে পড়ল উদোম মেঝেতে।

একটা পাঁউরুটি খেয়েছিল কোন্ সকালে। পেটের ভেতর সেই থেকে চাঁই-চুঁই করছে। খিদে-ফিদে নিয়ে অত ভাববার সময় পায় নি। দুপুরের মধ্যেই শেষ। টালির চালের বাঁশ থেকে ঝুলে পড়াটা কী এমন!

দোরগোড়ায় ন-কাকি।

'হ্যাঁরে, দুকুরে কী খাবি-টাবি সেসব ব্যবস্থা কিছু করে রেখেছিস?'

হানটা চুপ।

কাকি বললে, 'আজ দুপুরে আমার ঘরে খাস। যা—চান-টান করে আয়—যোগাড়ও করিস বাপু এক-একটা…'

কাকি চলে গেল হনহন করে।

এত দরদ কোথায় ছিল! বউ পালাতে সোহাগ উথলে পড়ছে যেন!

ভাতটা বড়ো জব্বর করে খাওয়া হল আজ। কুলি-বেগুন দিয়ে শুঁটকি মাছ যে কতদিন খায় নি!

খাওয়া-দাওয়া সেরে দরজায় খিল আঁটতে যাবে, ন-কাকি এসে বলল, 'অ হানটা, গোরুটাকে নিয়ে একটু যা না বাবা নপাড়ায়—কাল রাত্তির থেকে বড়ো চেল্লাচ্চে—'

হানটা বলল, 'এক্ষুনি?'

'একটু নয় জিরিয়ে নে খালে—বিকেলে আবার ঝড়-বাদল আসতে পারে।'

নপাড়ায় গোরুকে পাল খাওয়ানো হয়। হানটাই করে এই কাজটা মাঝেমধ্যে।

সে বলল, 'আচ্ছা যাচ্ছি।'

আজও হল না তাহলে। ন-কাকির ভাত খেয়ে বেইমানি করাটা ঠিক হবে না। সব পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিতে চায়। কালকেও একবার দড়ি খাটাতে গিয়ে পারে নি। মেজো বউদি ডাকতারের কাছে পাঠাল। বাচ্চাটার খুব জ্বর। রাত্তিরেও হয় না।

বুড়ো বাপটা ভয়ে অক্কা পেতে পারে। এইভাবে আগে-পিছে বাধা। হুটহাট এসে যাচ্ছে। কাঁহাতক কাটিয়ে চলা যায়।

'কই রে হানটা, হল?—' কাকি ফের হাঁক পাড়ে।

ঝটপট বেরিয়ে পড়ে হানটা। হাতে গোরুর দড়ি। দস্যি গোরুটা তাকেই টানতে-টানতে নিয়ে চলে।

# গড় শ্রীখণ্ড থেকে রাজনগর

অলোক রায়

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়[৪] কিন্তু তাঁর উপন্যাস তেমন প্রচারলাভ করে নি। অধিকাংশ উপন্যাস কম-নামি পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে—কোনো দিন বইয়ের আকারে ছাপা হয় নি। যেসব উপন্যাস প্রকাশকেরা ছেপেছেন, সেগুলিও সব এখন পাওয়া যায় না। অথচ এমন নয় যে তিনি উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, বা তাঁর উপন্যাস আদৌ কোনো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। তাহলে কি তিনি মুষ্টিমেয় পাঠকের জন্য লেখেন, বা পাঠকের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন? 'লেখকের লেখক'-জাতীয় কিংবদন্তী সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গেলেও, কোনো লেখক নিশ্চয় তেমন কথা ভেবে সাহিত্য রচনা করেন না। লেখক নিশ্চয় পাঠকের কাছে পৌঁছুতে চান,—পত্রিকা বা প্রকাশক এই কাজে সহায়তা করেন। হয়তো সমালোচকেরও কিছু ভূমিকা আছে লেখক-পাঠকের ঘটকালিতে। কিন্তু কোনো লেখক সব সুযোগ পেয়েও হয়তো দূরেই থেকে যান, সেক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্বও কম নয়।

অমিয়ভূষণ মজুমদার অনেক দিন উপন্যাস লিখছেন। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের মতো শতাধিক বই না লিখলেও, যে কটি বই তিনি লিখেছেন, তার বিষয়গত বৈচিত্র্য যেমন লক্ষণীয়, শৈলীর চমৎকারিত্ব ততোধিক। কোনো শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন—কখন অতীতাশ্রয়ী, কখন সমকালস্পর্শী,—কখনও রাজনৈতিক, কখনও একান্ত ব্যক্তিগত-সমস্যাপ্রধান। লেখার পিছনে নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য কাজ করে, কিন্তু

১। গড় শ্রীখণ্ড (১৯৫৭) ২। নীল তুঁইয়া (১৯৫৫) দ্বিতীয় সংস্করণ নয়নতারা (১৯৬৬) ৩। দুখিয়ার কুঠি ৪। নির্বাস ৫। উদ্বাস্তু ৬। মহিষকুড়ার উপকথা ৭। বিলাস বিনয় বন্দনা ৮। রাজনগর।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এমন উপন্যাস—১। চাঁদবেনে ২। মধু সাধুখাঁ ৩। দোম অন্তনিও ৪। মতি ঘোষ পার্ক ভায়গুড় লেন ৫। ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড ৬। বিবিক্তা ৭। তাসিলার মেয়র ৮। বিনদনি।





অনেক সময় ধরা যায় না অভিপ্রেত বক্তব্যকে। প্রত্যেকটি বইতেই স্বতন্ত্র প্রকরণ, এমনকি ভাষা পর্যন্ত আলাদা। বোঝা যায়, তিনি একটা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এত দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটে যে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ মেলে না। ফলে পাঠক বিভ্রান্ত বোধ করে, অথবা কোনো দীক্ষিত পাঠক গড়ে ওঠে না। অমিয়ভূষণ আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে চলেছেন, কিন্তু প্রত্যাশা কোনো বিশিষ্ট রূপ পাচ্ছে না। এর ফলে তিনি যেমন প্রশংসা পান, তেমনই আশাভঙ্গেরও কারণ হন। কিন্তু আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের আলোচনায় তাঁকে আর বাদ দেওয়ার উপায় নেই।

'গড় শ্রীখণ্ড' অমিয়ভূষণের প্রথম উপন্যাস (যদিও 'নীলতুঁইয়া' বই আকারে আগে বেরিয়েছে)। তিরিশ বছর আগে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় 'গড় শ্রীখণ্ড' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশের পর বইটির আর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়ে ওঠে নি, ফলে এখন রীতিমতো দুষ্প্রাপ্য এই উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস হলেও 'গড় শ্রীখণ্ডে'র মধ্যেই অমিয়ভূষণের ইতিহাসবোধ তথা কালচেতনার পরিচয় মেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে চলেছে (১৯৪৪-৪৫); মন্বন্তরের স্মৃতি তখনও তাজা, বিদেশী রাজ তখনই ক্ষমতা-হস্তান্তরের কথা ভাবছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারও খবর আসে (১৯৪৬)। এই সময়ে উত্তরবঙ্গের একটি জমিদার-পরিবারের রূপান্তরের ইতিহাসকে ধরতে চাইছেন অমিয়ভূষণ। গড়-চিকন্দির জমিদার পঞ্চাশোত্তীর্ণ সান্যালমশাই অতীত আর বর্তমানকে মেলাবার চেষ্টা করেন। তদানীন্তন রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনসা যে কথা বলে, সান্যালমশাইকে বোঝার জন্য তার প্রয়োজন আছে—'কাল আমাদের আঘাত করেছিল। কালের স্রোত যে-পথ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তা থেকে অনেক দূরে আমাদের অবস্থান, তবু তারই একটা আবর্তসংকুল ধারা প্লাবনের মতো এসে আমাদের কাল সম্বন্ধে সচেতন করেছিল, বিমুখও করেছে।' খাজনা আদায়ের জন্য জবরদস্তি (অন্যায়ভাবে বুধেডাঙায় সান্দারদের জমি দখল), মর্যাদা রক্ষার জন্য মামলা—সবই চলছে। কিন্তু সেই সঙ্গে 'পশ্চাতের আমি'র হাত থেকে আত্মোদ্ধারের চেষ্টা। আগের কালের সান্যালেরা নীলকর-ফ্রেজারকে দমন করেছিল, কিন্তু একালের সান্যাল-পুত্র কি সেই নজিরে মহাজন চৈতন্য সাহাকে দমন করতে পারবে? এর সঙ্গে গড়ে উঠেছে মহাজনের বিরুদ্ধে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মানসিকতা। সান্যাল মশাই-এর বড়ো ছেলে নৃপনারায়ণ বিপ্লবপন্থী, দুবার জেল খেটেছে, এখন অন্তরীণ। কিন্তু তার 'বিপ্লব তো আর আগ্নেয়াস্ত্রের দুমদাম নয়। সেটা বলে-কয়ে করা, ধীরে ধীরে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া গান্ধিয়ানা।' ফলে নৃপনারায়ণের পরিণাম আকস্মিক মনে হলেও অসম্ভব নয়। সুমিতিকে বিয়ের ব্যাপারেও বিপ্লব নেই, আকস্মিকতা আছে। হয়তো মধ্যবিত্ত পরিবার হলে দ্রুত সব ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যেত। কিন্তু সামন্ততন্ত্র আর আভিজাত্য ঠিক এইভাবে ভাঙে না। আস্তে আস্তে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। অনসূয়া একভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, সান্যালমশাই আর-একভাবে। কিন্তু বারবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে পিতাপুত্রের অবশ্যম্ভাবী বিরোধের—'আমার সঙ্গে তার বিরোধ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। লোকে বলবে অমুক-সান্যালের ছেলে জমিদারী-প্রথার ধ্বংস কামনা করে অথচ নিজের পৈতৃক ব্যাপারে অতি ভালো ছেলে।...বাপ-বেটার বিবাদ, সেটা ঠিক ধর্মযুদ্ধ হবে না। এ যুগের কেউই কূট-কৌশলের চেষ্টা না করে ছাড়বে না। শুধু আইন-বদলানোর আন্দোলন নয়, রক্তপাতও হতে পারে।' কিংবা, 'ছেলে রাজার শত্রু আর বাবা রাজার বন্ধু, এ কী করে হয়, কী করে চলতে পারে এমন অবস্থা।' কিন্তু 'গড় শ্রীখণ্ডে' বিরোধকে যেন প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। সান্যালপরিবারের ভাঙন ইতিহাসের নিয়মকে অনুসরণ করেছে,—কিন্তু অমিয়ভূষণ ইতিহাসের পটে ব্যক্তি-

কেই ধরতে চেয়েছেন। আর সেখানে জীবনের অনন্ত প্রবাহ মেনেও ব্যক্তির ব্যর্থতাবোধকে অস্বীকার করা যায় না—

> অনসূয়া ভাবলেন—জমিদারী-প্রথা নিয়ে পিতা-পুত্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হবে এই আশঙ্কা ছিল তাঁর। কিন্তু যে-ঘটনাগুলো ছেলেদের বেড়ে ওঠার মতো স্বাভাবিক তা যেন একটা পরাজয়ের মতো বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। জীবন যেন মৃত্যুবীজ বহন করে এনেছে।
>
> কিছুদিন থেকে তিনি [ সান্যালমশাই ] কখনো কখনো অনুভব করছিলেন, পথ আলাদা হয়ে যাচ্ছে তাঁর কারো কারো সঙ্গে।...সুমিতি এসেছিল এবং সে চলে যাবে, এ যেন তাঁর জীবনের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের অকালে মঞ্চাবতরণ এবং অন্তর্ধান। নিঃসঙ্গ নয় শুধু, পরাজিতও মনে হচ্ছে নিজেকে। চিন্তার এই পটভূমিকায় নতুন করে বাড়ি-ঘর তৈরি করা হাস্যকর কিছু বলে মনে হলো। দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গায় যে-দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন তা যেন নাটকীয়তার চূড়ান্ততা। লাল কাপড় পেঁচিয়ে পরে যেন বা যাত্রাদলের রাজা সেজেছিলেন তিনি।

কিন্তু 'গড় শ্রীখণ্ড' শুধু সান্যাল-পরিবারের কাহিনী নয়, উত্তরবঙ্গের একাধিক জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামের কাহিনী। তার মধ্যে সান্দারদের মেয়ে সুরো বা সুরতুন্নেছাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—তাকে দিয়েই উপন্যাসের শুরু, আর তাকে দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি। সেই সঙ্গে আছে 'বাঙাল নদী' পদ্মা আর তার তটভূমি—যা উপন্যাসকে দিয়েছে মাটির গন্ধ; আর মাটিঘেঁষা কিছু মানুষ—রামচন্দ্র মণ্ডল, মুঙ্‌লা, ছিদাম, আলেফ আর এরফান। গ্রাম আর শহরের মধ্যে নতুন এক ধরনের যোগাযোগ ঘটছে, যার ফলে সমাজস্থিতি চঞ্চল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই গ্রাম ছেড়ে জীবিকার্জনের জন্য শহরে যাওয়া শুরু হয়েছে (তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'য় পরিবর্তমান সমাজের ছবি ধরা আছে)। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধকালে নতুনভাবে পল্লীসমাজে ভাঙন দেখা দিল—শুধু মন্বন্তরের ধাক্কায় নয়, তার পরেও গ্রামের মানুষ শহরমুখী হয়েছে। এর পিছনে লুকিয়ে থাকা সমাজ-অর্থনীতির অবস্থান্তরকে ধরেছেন অমিয়ভূষণ।

> এরফান ফুসিতে মুখ দিয়ে দম মেরে রইলো, তারপর বললো, 'বড় ভাই, দুনিয়ার হাল কে ক'বি কও? আদমজাদ পয়মাল হয় না খায়। শুনছো না খবর? লোক দেশ ছেড়ে যাতেছে।'
>
> 'দেশ ছাড়ে কনে যায়?'
>
> 'কেন্, শোনো নাই? ওপারের কলে নাকি মেলাই লোক নিতেছে।'
>
> 'গাঁয়ের সব লোক খাবি এত বড়ো পেট কোনো কলেরই নাই, তা তোকে কয়ে দিলাম।'
>
> 'তা নয় নাই। সময়মতো হাতের নাগালে লোক না পালে সময়মতো তোমার চাষও হয় না, ধান ছিটানোও হয় না। কোন্ খোঁজ করে দেখলেই পারো বুধডাঙায় কয়ডা লোক আছে। কয়জন খেত আর লাঙল এক করলো, কও।'

কাহিনী যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দেশ-বিভাগের অল্প আগে আবার বাস্তুত্যাগের বর্ণনা। 'এদিকে এক রাজা আর ওদিকে এক নবাব। দেশ ভাগ হয়েছে। দুই নাম হয়েছে, একই ফলের দুটি টুকরোয়। কিন্তু ঠিক কোথায় কতদূরে সেই রাজসিক সীমারেখা, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাকেও কি দেশ ছেড়ে যেতে হবে?'—এ চিন্তা শুধু রামচন্দ্র মণ্ডলের নয়, সান্যালমশাই কয়েক পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে 'দেশভ্রমণে' বেরিয়েছেন। কিন্তু মহিমের মতো দলে-দলে যারা বেরিয়ে পড়েছে, তাদের এই যাত্রা—'তীর্থভ্রমণ নয়, দেশ-পর্যটন নয়, শ্মশানযাত্রা।' (অমিয়ভূষণ এই অধ্যায় নিয়ে পরে লিখেছেন 'নির্বাস' ও 'উদ্বাস্তু' উপন্যাস)।

'গড় শ্রীখণ্ড' একটা 'কাল'কে ধরে দিয়েছে, কিন্তু মহৎ উপন্যাস একদিকে যেমন কালচিহ্নিত, তেমনি







অন্যদিকে এক চিরন্তন সত্যের ইঙ্গিতবাহী। গড় শ্রীখণ্ড ও সান্যাল পরিবার ভাঙছে, কিন্তু অন্যদিকে এমন কিছু আছে যা ভাঙনের মধ্যেও নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। সেদিক থেকে 'গড় শ্রীখণ্ড' ব্যক্তি-প্রধান উপন্যাস নয়। রামচন্দ্র বা সুরতুন কেউই প্রধান চরিত্র নয়, কিন্তু এদের মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিকের পরম প্রত্যয়ের প্রকাশ—

> একটা হিংসা তার [ রামচন্দ্র ] মনের মধ্যে জাগতে সুরু করলো। তার ভূত-ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করে সহস্র বাধা। সেই বাধাগুলিকে ধ্বংস করার জন্য একটা হিংস্রতা মনের মধ্যে গুঁড়ি মেরে চলতে লাগলো। চতুর্দিকের ঘনসন্নিবিষ্ট অরাজকতার অরণ্যে একক চলতে হবে তাকে। সান্যাল মশাইরাও নেই। একা থাকতে হবে। একা যেন তাকে কোনো গড় রক্ষা করতে রেখে গেছে কেউ। জীবন কি? সেটাও যেন পদ্মার মতো একটা কিছু। সে না থাকলে কিছুই থাকে না, থেকেও শুধু ভয় আর বেদনা। দিনের আলোয় আলোর চাইতেও প্রখর হয়ে জ্বলে, ঝড়ের সন্ধ্যায় মুখ কালো করে সে চাপা গলায় গর্জাতে থাকে। এই জীবন কখন কার কোন প্রতিরোধ ধ্বসিয়ে দিয়ে আবর্তের মধ্যে টেনে নেবে এ কেউ বলতে পারে না।
>
> বন্যা থেমে গেলে হয়তো বোঝা যাবে, পদ্মা এবার আবার পাশ ফিরলো কি না—এটা তার প্রসাদ কিংবা রোষ।

## ২.

'গড় শ্রীখণ্ড' যখন লিখছেন অমিয়ভূষণ তখনই 'নীল ভুঁইয়া'র পরিকল্পনা তাঁর মনের মধ্যে ছিল এমন ধারণা অসংগত নয়। 'গড় শ্রীখণ্ড' বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কাহিনী, 'নীল ভুঁইয়া'র কাহিনী-কাল উনিশ শতকের মধ্যভাগ। আপাতদৃষ্টিতে দুটি কাহিনীর মধ্যে কোনো যোগ নেই, কিন্তু বিশ্লেষণে ধরা পড়বে 'গড় শ্রীখণ্ডে' যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের বাঙালি সমাজের পরিবর্তনের রূপটি ঔপন্যাসিক এঁকেছেন, তেমনি 'নীলভুঁইয়া' উপন্যাসে সিপাহি যুদ্ধের আগে-পরে কয়েক বছরের অনুরূপ এক ক্রান্তিকাল রঙে রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'গড় শ্রীখণ্ডে' সান্যালমশাই স্মরণ করেছেন 'মামাবাড়ির দেওয়ানজি'কে—'তাঁকে বোধ হয় তাঁর বেদিটা ছাড়া কল্পনা করা কঠিন। আমি তাঁকে বোধহয় শৈশবে দেখেওছিলাম। বকের পাখার মতো সাদা চুল, অতি শীর্ণ এক বৃদ্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে তাঁর মর্মর বেদিটায় বসে আছেন। তাঁর পরে যারা দেওয়ান হয়েছিল তারা সকলেই ম্যানেজারের পদবীতে রাজ্য শাসন করতো। যে-রানী তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন, যে-রাজার আমলে তিনি নীলকরদের শাসন করেছিলেন তাঁরা কেউ নেই। রাজার ছেলে তখন জমিদার। দেওয়ানজির স্থাপিত স্কুল ধ্বংস হয়ে গেছে, তাঁর লাইব্রেরির সেকেলে বইগুলো ধুলোর মতো মূল্যহীন, কিন্তু তাঁর সেই মর্মর বেদি আর তিনি যেন অবিনশ্বর একটি উপাসনা।' 'নীলভুঁইয়া'য় যে-দেওয়ান হরদয়ালকে আমরা পেলুম, তিনি উপাসনার জন্য স্মরণীয় নন, কিন্তু নীলকরদের আমলেই তাঁর দেওয়ানি, ইংরেজি স্কুল স্থাপনে তাঁর অপার আগ্রহ, বিরাট লাইব্রেরি-ঘরে তাঁর বাস। 'গড় শ্রীখণ্ডে'র থেকেও 'নীলভুঁইয়া' আরও কালচিহ্নিত বই—হয়তো এদিক থেকে 'নীলভুঁইয়া'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বললে ভুল হয় না। গ্রন্থকার অবশ্য জানিয়েছেন 'নীলভুঁইয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কারণ এর সবগুলি চরিত্রই কাল্পনিক। আবার এটি ঐতিহাসিকও, যেহেতু 'তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।'

'গড় শ্রীখণ্ডে'র মতো 'নীলভুঁইয়া' উপন্যাসেও পদ্মার ভূমিকা লক্ষণীয়। তবে এখানে ভৌগোলিক পটভূমির বিশদ বর্ণনা ঐতিহাসিক কাহিনীকে আরও

প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। ফরাসডাঙা বা মরেলগঞ্জকে খুব অপরিচিত দূরবর্তী স্থান মনে হয় না।' উপন্যাসের প্রথম বাক্যেই কাহিনীকাল নির্দেশ করা হয়েছে—'আঠারো শ' পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দ। শীতকাল।' উপন্যাসের শেষে হরদয়ালের কলকাতার বন্ধুর চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি—'এ-দেশের সিপাহীরা যেমন ইংরেজ মেরেছিল, এখন তেমনি ইংরেজরা সিপাই বধ করছে। বিপদোদ্ধারের আনন্দে কালীঘাটে পুজো দিচ্ছে সাহেবরা। এরপর জেলার সদরে-সদরে আনন্দোৎসব হবে।' সময়টা তাহলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। উনিশ শতকে সিপাহি বিদ্রোহের কয়েক বছর আগে এবং বিদ্রোহের কালে বাঙালি সমাজে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অমিয়ভূষণ সেই সময়কার সামাজিক ইতিহাসকে নানা উল্লেখের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতা (১৮৪৭-৫৩); বেথুন (বীটন) সাহেবের স্কুল স্থাপন (১৮৪৯); হীরা বুলবুলের পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করা নিয়ে আন্দোলন ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮৫৩); বিধবাবিবাহ আইন (১৮৫৬); সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭); নীলচাষ নিয়ে গোলমাল, হরিশ মুখুজ্যে, জেমস্ লঙ—এসব ঘটনা সমকালের উত্তেজনা নিয়ে ফরাসডাঙা-মরেলগঞ্জের পাশের গ্রামের মানুষদের স্পর্শ করেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। যেমন, সিপাহি বিদ্রোহের আগে নীল-আন্দোলন ও তার সঙ্গে হরিশ মুখুজ্যে ও পাদরি লঙের যোগ নির্দেশকালে ডানকান ঐতিহাসিক কালক্রম অগ্রাহ্য করেছে ('হরিশ মুখুজ্যেদের মতো লোককে শায়েস্তা করতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি কোন কোন আহাম্মক পরনিন্দা-বিশারদ পাদরী এর পেছনে আছে।··· কৃষকরা, চাষীরা আজ তাদের প্রভুকে সমালোচনা করতে শিখেছে।' (পৃ. ১১২)। 'আপনি শুনে থাকবেন, ফাদার লং বলে একজন নীলকরদের কাজের সমালোচনা করছে।' (পৃ. ২১৭)। এগারো পরিচ্ছেদের সূচনায় জানানো হচ্ছে [ বিধবাবিবাহ ] 'আইন হয়ে গেল।' আইন করলে কে? কলকাতার লাট?' 'আইন করলো বিদ্যাসাগর। লাটে কি আইন করতে পারে? সাহস পায় না।···' ইত্যাদি। কিন্তু সতেরো পরিচ্ছেদে বলা হল 'বিধবা-বিবাহ বিল পাস হয় নি।' পরের পরিচ্ছেদে জানানো হল [ বিধবা ] 'বনদুর্গা ও চরণদাসের বিবাহ হয়ে গেছে। খুব সহজেই হয়েছে বিবাহটা।' শিবনাথ শাস্ত্রী হেয়ার সাহেব সম্বন্ধে যে গল্প বলেছেন তার উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়—'তখন স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল যে হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই দলে দলে বালক—me poor boy, have pity on me, me take in your school বলিয়া তাঁহার পার্শ্বীর দুই ধারে ছুটিত।' উপন্যাসে এই গল্প বেথুনের উপর আরোপ করা হয়েছে—'কলকাতার লাল সুরকির পথ দিয়ে পালকি যাচ্ছে। কলেজ থেকে এ-সময়ে এ-পালকি বেরিয়েছে, বীটনসাহেব ছাড়া কেউ নয়। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে পালকির পাশে পাশে দৌড়চ্ছে। দুপুর রোদে ছেলেটি ঘর্মাক্ত। তার মলিন ধুতি ও মলিনতর উড়ুনির অসংবৃত অবস্থা। পালকির আরোহী ছেলেটির থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ডানদিকে মুখ করলেন। ছেলেটি দৌড়ে পালকির ও-পাশে গিয়ে সাহেবের চোখে পড়ার চেষ্টা করলো—মি পুয়োর বয় স্যার। মি টেক স্কুল, ভেরি ভেরি পুয়োর স্যার।' প্যারীচাঁদ মিত্রের পরিবর্তে কালীপ্রসন্ন সিংহের নামোল্লেখ—'এ পত্রিকা মেয়েদের জন্যই। রাধা সিকদার আর কালিপ্রসন্নর।'

অবশ্য উপন্যাসে এই সামান্য তথ্যগত অনৈক্য এমন কিছু বড়ো কথা নয়। অমিয়ভূষণ সমাজ-বিবর্তনের একটি পর্ব অবলম্বনে উপন্যাস লিখেছেন—তার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনা বা কয়েকটি নামের উল্লেখ। আসলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে শুধু







কলকাতা শহরে নয়, সুদূর গ্রামবাঙলাতেও পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। গ্রামে শুধু ডাকঘর নয়, ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হচ্ছে। আর সেই স্কুল স্থাপনার পিছনে আছেন হরদয়ালের মতো স্বশিক্ষিত মুক্তবুদ্ধি কিছু মানুষ, স্কুলে পড়ানোর জন্য এসেছেন বাগচীর মতো অত্যাশ্চর্য আধুনিক কর্মী আর ভাবুক।

হরদয়াল হিন্দু কলেজে পড়েন নি, কিন্তু চিন্তায় ভাবনায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরই একজন। পল্লী-গ্রামে রানীর দেওয়ান হিসাবে তাঁর আবির্ভাব কেমন করে সম্ভব হল তার ইতিহাস উপন্যাসে নেই, কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতামত থেকেই মানুষটিকে বোঝা যায়—'খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যারা একান্ত অগ্রসর, যারা মানুষের সুখদুঃখে বিচলিত হয়ে খ্রীষ্টানী বিধানগুলি, খ্রীষ্টান সমাজের বিধিগুলিও নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের মতো কথা বলছে দেওয়ান। আপাতদৃষ্টিতে সেটা একটা নিরীশ্বর সমাজব্যবস্থা। বক্তৃতা শেষ করে দেওয়ান বললো, 'এর জন্য শাস্ত্র থেকে নজির দেখানোর কোনো দরকার নেই। যা অন্যায়, তা অন্যায়ই। বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্যা যদি আমার থাকতো তবে আমি এই ঘোষণা করতাম—ভালো এবং ন্যায় এ-দুয়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দেখানোই দুর্বলতা। ভালো এবং ন্যায়কে অনেক সময়ে বলপ্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আইন হয়নি, না-হোক; বেআইনী হলেও ন্যায়ই সব আইনের বড়ো।" প্রতিবেশী নীলকরদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর কূটবুদ্ধিরই পরিচয় মেলে বেশি, কিন্তু সেই সঙ্গে এক ধরনের জাতীয়তাবোধও প্রকাশ পায়—"সত্যি যদি নীলকরের স্তূপের মাথায় ওড়ানো ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকাকে ওরা নষ্ট করেই থাকে তবে সবটুকু সত্য বলতে গেলে কি এ-ও বলতে হয় না যে, ওরা একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছে মাত্র? নীল-করের কি নৈতিক অধিকার আছে অন্যায়ের জাহাজে রাষ্ট্রীয় পতাকা স্থাপন করার? সে তো তার রাষ্ট্রের প্রতিভূ নয়। সে শুধু চায় তার রাষ্ট্রের অস্ত্রবলের ভয় দেখিয়ে পদ্মার বুকে অন্যায়ের জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে। পর্তুগীজ হারমাদদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? সেই সব হারমাদদের যারা জব্দ করেছিল তারা কি অন্যায় করেছে? না। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে মরেলকে জব্দ করাও অন্যায় হয় নি।" কিন্তু সেই সঙ্গে ডানকানকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে হলেও তিনি যখন মেকলের বিখ্যাত উক্তির প্রতিধ্বনি করেন—"এ-দেশের এই লোকগুলি এবং আপনাদের শাসক-জাতির মাঝখানে এমন একদল এ-দেশীয় লোক দরকার যারা শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায় আপনাদের অনুকরণ করে, এবং আপনাদের শাসন এ-দেশের কাছে প্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে।' তখন মনে হয় নিজের অজ্ঞাতে হরদয়াল বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন এই ধরনের প্রবোধবাক্যে। ইংরেজি স্কুল স্থাপন তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, সেখানে তিনি প্রগতিপন্থী। কিন্তু ইংরেজশাসন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব সেকালের প্রগতি-পন্থার অনিবার্য পরিণাম—একদিকে "দেশ ইংরেজের বটে, ডানকানের নয়। যে-দেশে বার্ক জন্মায়, যে-দেশের মাটিতে ফিলিপ সিড্‌নি জন্মায়, যে-দেশের লোক বীটন সাহেব, সে-দেশে ডানকানদের মতো মূর্খ জন্মায় বটে, তাই বলে সে-দেশের প্রতিনিধি হয় না।" অন্যদিকে "আসল কথা কি জানো, ইংরেজ এসে আমরা বেঁচেছি। তৃতীয় পক্ষের দরকার ছিল।··· আমি অনেকদিন ধরেই ভেবেছি ইংরেজ আমাদের কাম্য ছিল।···[ মধ্যযুগে ] শুধু ধ্বংসই হলো, সৃষ্টি হলো না। এ তো ভালোই হয়েছে রাজকুমার, কিছু-দিন ধ্বংসের শেষ হোক। কিছুদিন না হয় পরাধীনই রইলাম।" এই বিরোধ ইংরেজিশিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিরোধ—সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন জানান নি তাঁরা, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে হরদয়ালের মতো মনে হয়েছে তাঁদের—"ডানকানদের অত্যাচারের কথা হরদয়াল জানে। ডানকানদের মনোভাবও সে জানে। হরদয়ালের মনে হলো, গোবর্ধনমাস্টার যেন মাস্টারি-ভাষায় তার অঙ্কের হিসাবে গোড়ার ভুলটা দেখিয়ে

দিয়েছে।" 'নীল ভুঁইয়া'র শেষে যখন রানী হঠাৎ জানালেন 'তোমাকে বরখাস্ত করা হলো' তখন হরদয়ালের প্রতিক্রিয়া কিছুটা বিস্ময়কর মনে হয়। তিনি গ্রাম ছেড়ে যান না, সে কি শুধু স্কুলের প্রতি মমতায়? উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে সন্ধ্যার আলো-আঁধারির মধ্যে স্কুলের দিকে মুখ করে হরদয়ালকে বসে থাকতে দেখা যায়। অথচ পরবর্তী কালে 'রাজনগর' খণ্ডেও হরদয়াল রানীর বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনধারারও কোনো পরিবর্তন হয় নি। তেমনি বিলাসবৈভব, বিদেশী বই বা পত্রিকাপাঠ,—অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন না হরদয়াল। হয়তো সেখানেই হরদয়াল চরিত্রের পূর্ণতা—মধ্যবিত্ত ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির প্রতিনিধি হয়ে ওঠা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হরদয়াল চরিত্রের মধ্যে বিকাশ এবং অভিব্যক্তি দুইই দেখেছেন, এবং সেখানেই হরদয়াল চরিত্রের সার্থকতা তাঁর মনে হয়েছে। (দ্র. উত্তরসূরী, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮)।

চন্দ্রকান্ত অ্যাণ্ড্রুজ বাগচী ঠিক প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র নয়। মিশনারিদের সঙ্গে কাজ করলেও মিশনারি নয়, ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেও স্বদেশীয়ানা ত্যাগ করতে পারে নি। ভারতবর্ষে ইউনিট্যারিয়ান চার্চ খুব প্রসার লাভ করেনি, কিন্তু উনিশ শতকে ভারতবর্ষে অ্যাডাম থেকে শুরু করে ডাল্ পর্যন্ত যে কজন ইউনিট্যারিয়ান মিশনারি এসেছেন, তাঁদের পরোক্ষ প্রভাব অপরিসীম। ইউনিট্যারিয়ান মতাদর্শ ইউরোপে এবং এদেশে যুক্তিবাদী মানবতাবাদ প্রসারে সাহায্য করেছে। রামমোহন রায় খ্রীষ্টধর্মের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন—"আমাদের মতবাদে যিশাস ক্রাইস্ট মহামানব কিন্তু দেবতা নন, দেবতার পুত্রও নন। আমরা মনে করি যিশাস যে-অর্থে ঈশ্বরের সন্তান বলে নিজেকে মনে করতেন তাঁর জীবনচরিতকাররা সে-অর্থ বুঝতে পারেন নি। আমরা মনে করি ঈশ্বর একমাত্র, এবং অদ্বিতীয়, এবং তিনিই মাত্র মানুষের উপাস্য।' সি. এইচ. ডাল পরবর্তী কালে নিজেকে 'ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান' বলতেন, কারণ ইউনিট্যারিয়ান পাদরির পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না (অবশ্য ব্রাহ্মরা ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেন নি)। এইভাবে ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এক নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অমিয়ভূষণ উনিশ শতকের মধ্যভাগে সমাজবিবর্তনে খ্রীষ্টান পাদরিদের ভূমিকার কথা বারবার বলেছেন। 'তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে' দেখাতে হলে শুধু লঙ নয়, অন্য পাদরিদের কথাও বলতে হয়। ডানকানের সঙ্গে বাগচীর বিরোধ তাই ব্যক্তিগত বিরোধ মনে করলে ভুল হবে। (ইংরেজললনাকে ভারতবাসীর বিবাহ অন্য ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল—'কেট বাগচীকে বিয়ে করায় ওদের আত্মম্ভরিতায় আঘাত লেগেছে।' 'ইংরেজমহিলা বিয়ে করে সাধারণের চোখে বাগচী প্রমাণ করে দিয়েছে ইংরেজরা অতিমানব নয়।') কিন্তু খ্রীষ্টান বাগচীর জীবনদৃষ্টিকে সেকালের পাদরিদের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা যায় না—দেশী বা বিদেশী কারো সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই। ডানকান বাগচীকে 'বাগদী' মনে করে, গ্রামের নিরক্ষর চাষী বাগচীর হাত থেকে ওষুধ খেলে জাত যায় ভাবে।

উপন্যাসে সমস্যা একমাত্র নয়নতারাকে নিয়ে। রাজচন্দ্র বলেছেন, "একটা বিপ্লবের সময় এসেছে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেসব বিপ্লবের চাইতেও তুমি অপূর্ব।" এমন ধারণা জন্মালে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এই 'অপূর্ব' নয়নতারাকে নিয়েই অমিয়ভূষণ উপন্যাস লিখছেন—হরদয়াল বা বাগচী উপন্যাসের অলংকরণ মাত্র, 'নীলাক্ত সমাজ'ও কোনো গুরুত্ব পায় নি, আর তাই উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণে 'নীলভুঁইয়া' নামটি অবান্তর বিবেচনায় নতুন নামকরণ করতে হয়—'নয়নতারা'। অমিয়ভূষণ অবশ্য 'নয়নতারা'র ভূমিকায় জানিয়েছেন—"নামবদলের কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলা দরকার যে 'নীলভুঁইয়া' নামে যে ট্রিলজি লেখকের কল্পনায় ছিল, প্রকৃতপক্ষে এটি তারই প্রথম খণ্ড। সংকল্প ছিল সমগ্র ট্রিলজি 'নীলভুঁইয়া' নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এখন অনুমান করছি কাহিনীর স্বয়ংসম্পূর্ণতার দরুণ বিভিন্ন খণ্ডের পৃথক নামকরণ যুক্তিযুক্ত হবে যদি পরিকল্পিত ট্রিলজির পরবর্তী খণ্ডগুলি লেখা সম্ভব হয়ও। সুতরাং লিখবার সময়ে ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশকালে এই খণ্ডটির যে নাম ছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হলো।" কিন্তু 'রাজনগর'কে যদি ট্রিলজির দ্বিতীয় খণ্ড মনে করি, তাহলেও 'নীলভুঁইয়া' নামকরণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা সহজ হবে না। 'রাজনগর'ও সম্ভবত নয়নতারারই কাহিনী, অন্তত রাজচন্দ্র-নয়নতারা দুই খণ্ডেই 'নীলাক্ত সমাজ'-কাহিনীর থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অথচ নয়নতারাকে যদি উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন মনে করি, তাহলে উপন্যাসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য শুধু কমে যায় তাই নয়, উপন্যাসের চরিত্রপরিকল্পনাও কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ প্রতিভাত হয়। নয়নতারা সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা না গেলেও তাকে তাৎপর্যহীন বলা যায় না—"নয়নতারার মধ্যে যেখানে dynamic element পাচ্ছি সেখানেই তার ব্যবহার (behaviour) অস্বাভাবিক এবং এতটাই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে যে তখনই তার মুক্ত অস্তিত্বতে সন্দিহান হয়ে পড়েছি। সে emancipated নারীর মতই ব্যবহার করছে। (ধরা যাক, আধুনিকতমা স্বাধীনা প্রমত্তারা ঐ রকম ব্যবহার করেন) এই প্রথাবিগর্হিত ব্যবহার কিন্তু freedom-এর প্রাণবস্তু নয়। তার নঙর্থক মাত্র। অর্থাৎ আমার মতে নয়নতারা অ-সম্পূর্ণ। এইখানে অমিয়বাবু জিততে পারেন নি। নয়নতারা বাঙলা সাহিত্যে অপূর্ব বললে সব কথা বলা হল না। অপূর্ব সৃষ্টিটাই আসল। এবং সম্পূর্ণ না হলে অপূর্ব সৃষ্টি কি সম্ভব?"

## ৩.

'রাজনগর' শুধু অমিয়ভূষণের সম্প্রতিকালে প্রকাশিত উপন্যাস বলে নয়, অথবা 'নীলভুঁইয়া'র দ্বিতীয় পর্ব বলেই নয়, 'রাজনগর' অমিয়ভূষণের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী, এবং এ-যাবৎ প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। দেশকালকে নানা উল্লেখ-বর্ণনার মধ্য দিয়ে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। 'রাজনগরে'র কাহিনীকাল ১৮৫৯-৬১ মনে করার সংগত কারণ আছে (যদিও প্রথম পরিচ্ছেদে জানানো হয়েছে 'বোধহয় মৃদু মৃদু বাতাস একটা আছে ১৮৬০-এর শেষ হেমন্তের ঠাণ্ডাকে বাড়ানোর মতো।') 'নীলভুঁইয়া'র কাহিনীর সমাপ্তি ১৮৫৮ সাল। তার অল্প পরেই 'রাজনগরে'র কাহিনীর সূচনা। 'নীলভুঁইয়া'র সঙ্গে 'রাজনগরে'র যোগসূত্র রচনায় শুধু প্রধান সবগুলি চরিত্রের পরিগতিধারা কাজ করে নি, 'নীলভুঁইয়া'র অনেক ঘটনার পুনরুল্লেখের মধ্য দিয়ে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে (হরদয়ালের ডায়রিতে নিজের প্রসঙ্গে সত্যনির্ভর ইংরেজিনবিশ ছাত্রদের উল্লেখ, রানীমার জন্মতিথির উৎসবের পিছনে মরেলগঞ্জের কটুভাষী তহশীলদারকে রাজকুমারের হত্যা করার ব্যাপারকে চাপা দেওয়া, দেওয়ান হরদয়ালের পদচ্যুতির পিছনে বাগচীমাস্টার ও কেটের গ্রামের থাকার প্রসঙ্গ, হরদয়ালের প্রতিক্রিয়া, রাজকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ প্রভৃতি)। ১৮৫৯-এর রানীর জন্মতিথির উৎসবে "ডানকানরা এলো না। সে বললো, কলকাতায় কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ৫৭-৫৮-র সেইসব ব্যাপারের পরে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা দূরে দূরে সরবে।" ১৮৬০-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজকুমার কলকাতায় ছিলেন। ১৮৬০ সালের ইনডিগো কমিশন উপন্যাসে ভালোভাবে বর্ণিত হয়েছে (যদিও ডিসেমবর-জানুয়ারি মাসে কমিশন বসে নি, এবং কৃষ্ণনগর ছাড়া কলিকাতার বাইরে কোথাও কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণ করে নি)। ডানকান "হয়তো কমিশন নয়, স্ত্রী-পুত্রের কথাই ভাবছে। তারা সেই ৫৭-তে হোমে গিয়েছে,

এদেশে আসতে চাইছে না। যদিও ১৮৫৭-৫৮র ব্যাপারগুলো তারা প্রত্যক্ষভাবে জানে না। ফলে এখন এই ১৮৬০-এর শেষেও মরেলগঞ্জ স্ত্রীলোকহীন।" ...'১৮৫৯-এর চাষীদের ঔদ্ধত্যের কথা ভাবো।' লাট-সাহেব সার জন পিটার গ্রান্ট্ ১৮৬০ সালের সেপটেমবর মাসে রাজনগর এসেছিলেন মনে করা যেতে পারে (দ্র. বাকল্যান্ড ১)। তাহলে উপন্যাসের শেষে যে-গুডফ্রাইডের দিনে গুলি চলল তা কি ১৮৬১ সালের ঘটনা নয়?

কিন্তু সালতারিখের কচকচি থাক। মোটের উপর সময়টা বোঝা গেল ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১। সমকালের ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বারে-বারে ছুঁয়ে যান লেখক ঘটনা-বর্ণনার ফাঁকে-ফাঁকে। 'সদ্য বিলেত-আগত' কীবল-এর মুখ থেকে শুনি প্লীমাথে স্টিমার চলছে, ক্রিমিয়ারযুদ্ধ আর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ভূমিকা, সেন্ট টমাসের হসপিট্যালে নার্সদের জন্য স্কুল খোলার প্রস্তাব। কায়েতকুমার মুকুন্দের ওয়াং (তাই-পিং) বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সেনাবাহিনীতে সাবলটারন হয়ে যোগদান। ইংল্যানডে উনিশ শতকে ধর্মীয় আন্দোলন—ডিসেনটার, এভানজেলিসট ও কোয়েকারদের ভূমিকা; এই থেকেই বাঙলাদেশের কথাও এসেছে—'কি লনডনে কি ক্যালকাটায় 'শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই এখন ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখুন। প্রচলিত পদ্ধতি যাচাই করে দেখছে অনেকেই। নতুন পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছেন যেন ঈশ্বরের দিকে।' শিরোমণির সঙ্গে সর্বরঞ্জনের বিরোধ নৈয়ায়িক তর্কে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবজীবনসমস্যায় পরিণত হয়েছে; বাগচীর মনে হয়েছে 'জন্মান্তরবাদ নয়, কর্মফল নয়, সবই যেন এক উদাসীন মহাকালস্রোতে ভাসমান। কী সাংঘাতিক কথা, তা হলে ক্রাইস্ট দূরের কথা, ঈশ্বরই থাকেন কি?' চরণদাস ভেবেছে, "কিন্তু ধর্ম বলে কি কিছু সত্যিই আছে যা থেকে অন্যায়ের পাপের শাস্তি হয়? কে শাস্তি পায়? সেই আত্মা বলেই কি কিছু আছে? পায় না কি ডানকানরা শাস্তি? না কি ওদের ধর্মে তেমন করে মানুষকে পীড়ন করা অন্যায় নয়? পাপ হয় না, বাঘ মানুষ খেলে যেমন তার পাপ নেই, যেমন আমরা মোষ-গোরুকে পিটলে পাপ নেই?" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেনের প্রসঙ্গ এসেছে, ব্রাহ্মধর্মান্দোলন মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে হলেও কেমন আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। (সর্বরঞ্জনপ্রসাদ কুসুম নিয়োগীকে ব্রাহ্মদের ক্যারিকেচার মনে করলে কি লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে?)। আসলে সব মিলিয়ে একটা আলোড়ন, যাকে জাগরণ মনে করলে ভুল হয় না—"তখনকার দিনে মধ্য, নিম্নমধ্যবিত্ত স্কুলকলেজে পড়া মানুষদের মধ্যে ধর্মমত, সুনীতি, দুর্নীতি নিয়ে, স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও নানারকমের সমাজ-সংস্কার নিয়ে আলাপ-আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছিল। গো মাংস খেয়ে, মদ্যপান করে সমাজ-সংস্কার করার চাইতে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও তাদের পর্দার বাইরে আনা এগুলোই সমাজ-সংস্কারের উপাদান হিসাবে মূল্য পাচ্ছে ক্রমশ, যদিও কি উকিল, কি ডাকতার, কি ইংরেজ ব্যবসায়ীর মুৎসুদ্দি, কিছু সংগতি হলেই উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখাকে জীবনের সাফল্যের নিদর্শন মনে করছে। তখন মিশনারিরা ১৮৫৭-র আশঙ্কাকে কাটিয়ে উঠতে না পেরে ক্রাইস্টের মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধর্মের কুৎসা প্রচারের ব্যাপারটায় ঢিলে দিয়েছে। ভারতীয়রা বুঝতে পারছে, নামে মাইকেল, এমন কি রেভরেনড যুক্ত হলেও জীবনের প্রেয় সহজলভ্য হয় না। কিন্তু পৌত্তলিকতা যে মন্দ তা নিয়ে তর্কের অবকাশই ছিল না। শিক্ষিত হলে কথা নেই, এমন কি স্কুলের ছাত্র কি এক গ্লানিতে উপনিষদে মুখ লুকাবে যেন। ইংরেজ রাজা হওয়ায় এই এক সুবিধাও ছিল, পথে ঘাটে প্রকাশ্যে ধর্ম নিয়ে কথা বললে কাজীর লোকেরা ধরতে আসে না। তখন তো নতুন যে ব্রাহ্মধর্ম, তাতেও কোনো শাখা আর্ড-গার্দ এমন তর্ক যেন দেখা দেবে। বেদ অপৌরুষের কি না, উপাসনা-বেদীতে অব্রাহ্মণ বসবে কি না—এসব সমস্যা পার হয়ে তখন উপবীত-ত্যাগের আন্দোলন হচ্ছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে নববিধান বিচ্ছিন্ন হয় নি বটে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রাইস্ট সম্বন্ধে কোনো-কোনো মন্তব্যের ফলে কোনো-কোনো ব্রাহ্ম পত্রিকায় গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক হচ্ছেন। তখনও কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে ব্রহ্মকে মা বলে ডাকতে শুরু করেন নি, বিজয়কৃষ্ণ নিরাকার ত্যাগ করে সাকারে ঝোঁকেন নি। তা হলেও ধর্ম তখন এক নিরতিশয় উত্তেজক বিষয়। অন্যদিকে তখন এদেশের ভাষায় নাটক লেখা হচ্ছে। এটা কৌতুকের যে নাটকের পৃষ্ঠপোষকেরা ব্যক্তিগত জীবনে মদ আর ভ্রষ্টাদের সঙ্গে যে ভাবেই সংশ্লিষ্ট হোক, নাটকে সেসবের সমালোচনা দেখা দিচ্ছে, রায়তদের কষ্টের ইঙ্গিত থাকছে। কিন্তু সেইসব প্রাগ্রসর মানুষের প্রাগ্রসর অংশে নাটক সম্বন্ধেই বিরূপতা দেখা দিচ্ছে, কারণ নাটক অলীক, নারী-সংযুক্ত বিষয়। তখন একদল মদ খেতে না শেখায় পুত্রস্থানীয়দের কী করে ভদ্র-সমাজে পরিচিত করবেন ভেবে চিন্তিত, অন্য এক অংশে তখন মদ্যপান নিবারণ সম্বন্ধে ভাবা হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো অনেকে ব্রাহ্ম হয়েও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়ট শুধু শহর কলকাতায় নয়, গ্রামবাঙলাতেও মানুষকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে—"বাগচী অনুমান করেছিল চরণদাস হয়তো হিন্দু পেট্রিয়ট থেকেই নীলকরের প্রতি একটা গভীর বিদ্বেষ সংগ্রহ করে থাকবে, কারণ বাগচীর ধারণা ছিল হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ নীলকরদের কঠিন সমালোচক। বিশেষত গত এক বছর থেকে।"

এইভাবে 'নীল ভূঁইয়া'র থেকেও 'রাজনগর' আরও বেশি কালচিহ্নিত উপন্যাস হয়ে ওঠে। শুধু ধর্ম নিয়ে তর্ক নয়, শিক্ষা নিয়েও নতুন করে তর্ক দেখা দিয়েছে। দেওয়ান হরদয়াল তখন পুরনো কালের মানুষ বলে চিহ্নিত হচ্ছেন,—"দেওয়ানজি ডিরোজিও ধারার মানুষ, নিরীশ্বর, দুর্বিনীত, মদ্যপায়ী আধুনিকদের একজন যারা নষ্ট স্ত্রীলোকসংসর্গে সংকুচিত হয়? না, না, একথা আমাকে বলতেই হবে দেওয়ানজি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা এক সময়ে ভয়ংকর রকমের আধুনিক ছিল, কিন্তু এখন কলকাতার চোখে আর আধুনিক নয়। না, আধুনিক নয়।" তুলনায় বাগচী এবং নিয়োগীর মধ্যে শিক্ষাদর্শগত বিরোধ সত্ত্বেও তাঁরা এই সময়ের আধুনিক—

"নিয়োগী বললো, সার আপনার প্রশ্রয় আমাকে তর্ক করতে সাহসী করেছে। কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হয়। কিন্তু তা কি অন্যায়? সেকালের রাজা রামমোহন, একালের বিদ্যা-সাগর কি ইংরেজি শিক্ষার গুণগ্রাহী নয়?

"বাগচী বললো, উভয়েই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু তাঁরা কি ইংরেজি পড়ে পণ্ডিত? কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। আপনি কি এদেশের চাষীদের সঙ্গে, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ধর্ম নিয়েই, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদি নিয়ে, পাপপুণ্য সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করেছেন? তাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, কিন্তু—

"—সেটা হয়তো কথকতা ইত্যাদির ফলে। কিন্তু তাদের সেই জ্ঞানই তো কুসংস্কারের উৎস।

"—কুসংস্কার? হয়তো, হয়তো। আমি চাইছি আমাদের ছাত্ররা আপাতত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কিছু, আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানুক। সময়ের ব্যবধান কমাতে চাইছি। শুধু ইংরেজি ভাষার উপর জোর দিলে একটা ইংরেজিনবিশ সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী তৈরি হবে যারা আর সকলকে মূর্খ আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করবে।"

অমিয়ভূষণ উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতের স্বরূপকে বুঝতে চান, এবং বোঝাতে চান—"কাছারীতে তখন রানীমার জন্মোৎসবের কথাই প্রাধান্য পাচ্ছিলো—তা ঠিকই, কিন্তু সেই এক রকমের যুদ্ধ, যার অন্য নাম আধুনিকতাও বলা যায়, তার

কথাও এসে পড়ছিল।" "এখানে যেন পরে যা হবে তার সূচনা সেবারই দেখা দিয়েছিল। একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা। তুমি তোমার ধর্মমত, আর্থিক সংগতি এমনকি চামড়ার রং নিরপেক্ষ অন্য সকলের সমান। এ কি আগে কখনও ছিল? তুমি বিধর্মী হলেই কোণঠাসা, তোমার চামড়ার রং কালো বলেই তোমার কথা মিথ্যা এই না এতদিন পাঁচশ বছর ধরে, হয়ে এসেছে। এখন দেখা সমান হচ্ছে।" অবশ্য ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা নিয়ে তর্ক বেড়েছে বই কমে নি। আইনের আশ্রয় গ্রহণ করলেই কি সব সমস্যার সমাধান? তা নয়, তারই প্রমাণ মিলল ইনডিগো কমিশনের সময়ে।

আসলে শোষণের রূপ পালটেছে, কিন্তু শোষণের অবসান হয় নি। বাগচী তাঁতিদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ সন্ধানে বাঙলার অর্থনৈতিক অবস্থা তথা শোষণের আর-একটি দিকের পরিচয় পেয়েছেন—"হাজার বছর ধরে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠেছ ওদের, এবার ওরা আইন করে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠবে। শুধু কি কাপড়? ইস্তক খোন্তা, কুড়ুল, দা, হেঁসো সেই জাহাজে আসছে।" "আসলে, হুজুর, রোগটা অনেক দিনের। সেই ছিয়াত্তরের রক্তবমি। রাজবাড়ি আর পেত্রোর চেষ্টায় ওস্তাদেরা বেঁচেছিল, কিন্তু পাঁচ আনি লোক, কাটুনি-জোলা, রজক-ওস্তাগর, কামার-কুমোর, গুড়ে চাষী শেষ হয়েছিল। পেত্রো বলতেন, তারপরে শরীর সারে নি, জাতটাই আধ হাত কমে গিয়েছে।" "দাদনদার হতে বাজার জাত হতে হয়। দাদনের কাজ আদায় হয় না সহজে, আগাম টাকা গরীবের পেটে ঢুকে যায়। আদায় করতে—তো ইংরেজ তা করে বাঁচে, অন্যের মিয়াদ হয়।" তাহলে সমস্যাটা শুধু নীলকর সাহেবদের নিয়ে নয়, দাদনদার-বরাতদার-মহাজন সাহেবদের নিয়েও বটে।

অন্য ধরনের সামাজিক সমস্যার কথাও অমিয়ভূষণ ভেবেছেন। বাগচী এবং কেটের কাহিনীগত প্রয়োজন ছাপিয়ে উঠেছে সমাজে তাদের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির প্রশ্ন। গাইলসের চিঠি শুধু বাগচীকে ভাবিয়েছে তাই নয়, এ থেকেই ও'স্থলিভানের অবতারণা ঘটেছে—"যারাই কোনো না কোনো দিক দিয়ে ইংরেজ রক্তে সংশ্লিষ্ট তাদের এখন ভাবার সময় এসেছে। পিতা ইংরেজ, আইরিশ কিংবা স্কচ, মাতা মুসলমানী, গোয়ানীজ অথবা আদিবাসী খ্রীশ্চান হোক, পিতার ধর্ম প্রোটেস্ট্যাণ্ট, ক্যাথলিক, প্রেসবিটেরিয়ান যাই হোক, তাদের এখন এক হতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, কি ভারতের সরকার, কি ইংল্যাণ্ডের সরকার কেউই তাদের ইংরেজ বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না আর। এক কথায়, ভারতীয় ও ইউরোপীয় মিশ্র রক্তের লোকেদের কোনো ভবিষ্যৎই দেখা যাচ্ছে না—না এ দেশে, না ইংল্যাণ্ডে।" ও'স্থলিভান চরিত্র পরিকল্পনাকালে ডিরোজিওর কথা মনে ছিল লেখকের—"আমার কাছে চাকরি চাইতে এসে কলকাতার কয়েকখানা পত্রিকা দেখিয়েছিল, যাতে ওর কবিতা ছাপা হয়েছে।" স্কুলের চাকরি যাওয়ার কারণ—"হিন্দুদের কুসংস্কারের কথা বললে তত গোল হতো না, মদ আর গোরু না খেলে মানুষ সভ্য হয় না এ বললেও ক্ষতি ছিল না। রটেছিল যে, ও না কি বলতো ভাইবোনের বিবাহে দোষ নেই। আসলে যিশুকে, মানে, মাতা মেরীর কুমারীত্বেই সন্দেহ। স্কুল কমিটির হিন্দু-ক্রিশ্চান সব সভ্যই তার বিরুদ্ধে চলে গেল।" ইনডিগো কমিশনে ও'স্থলিভানদের ভূমিকা গ্রহণ কতটা ঐতিহাসিক তথ্যসম্মত তা জানি না। কিন্তু ও'স্থলিভানদের না ঘরকা না ঘাটকা ভূমিকা ঐতিহাসিক।

কিন্তু 'নীলদুঁইয়া' যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, 'রাজনগর'ও তেমনি সংকীর্ণ অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। নীলচাষ বা নীলবিদ্রোহের কথা এখানে এসেছে বটে, কিন্তু নায়েবের সঙ্গে বা রাজকুমারের সঙ্গে, এমনকি রানীর সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ অনেকটাই ব্যক্তিগত আত্মাভিমানের প্রকাশ। আসলে অমিয়ভূষণ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ব্যক্তিজীবনের







সংকটসমস্যাকেই উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। সেখানে একদিকে এসেছে বেঁচে থাকার তত্ত্ব—"কেন ঠিক বলা যায় না বটে, কিন্তু বেঁচে থাকতেই হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা সত্ত্বেও, জীবনের যেন একটা নিজস্ব টান আছে। মনে হয় যার জীবন আর যে ভাবে তারা এক নয় যেন।" রাজকুমার, নয়নতারা, হরদয়াল, বাগচী, কেট—সকলেই বাঁচতে চেয়েছে। তাদের জীবনের প্যাটার্ন এক নয়, কিন্তু প্রত্যেকের মনেই যেন সেই বঙ্কিমী প্রশ্ন—"এই জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" কোনো সন্দেহ নেই এই জীবনজিজ্ঞাসা থেকে মহৎ উপন্যাসের জন্ম হতে পারে। অন্যদিকে সময় বা কালের ভূমিকা এই জীবনজিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। 'নীলদুঁইয়া' উপন্যাসেও এই 'কালে'র কথা এসেছিল একভাবে, 'রাজনগরে' আবার—"তোমার কাছে আকবর বাদশার কাল আর রাজুর কালে ব্যবধান নেই। রানীমার মন্দির কখন আকাশ স্পর্শ করে, কখন আবার মাটিতে মিশে যায় দু-তিনশ' বছরের সে ব্যবধানও তোমার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু তুমি তো মহাকাল, সৃষ্টির উৎস। স্নেহ নেই কেন? সময়ের ব্যবধানে আমাদের যা অতীত হয়ে যায় তা কি তুমি করুণায় পূর্ণ করো না?"

রাজকুমার বারেবারে চেষ্টা করেছে গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে। কেটের সঙ্গে কথা বলার সময় নেপোলিয়ানের প্রসঙ্গ উঠেছে—"রাজা একটা ধারণামাত্র, তার শরীর কোথায়? সব রাজা জানে না, কিন্তু জানা তো উচিত যে রাজা অনেকগুলি মানুষের স্বাধীনতার ধারণা; শক্তির ধারণা। সেটা গেলে রাজাই বা কোথায়?"…"নির্জন, সব সময়ে মেঘ আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার একটা দ্বীপের কথাই মনে হলো। নিঃসঙ্গ নয়? খুবই নিঃসঙ্গ, নিকটজন কয়েকজন থাকা সত্ত্বেও।" (নজরবন্দী হয়ে রাজকুমারকেও এমনি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছে)। শর্প্যার রিভলিউশনারি স্টাডি বাজাবার সময় "ইস্প্রভাইজ করা হচ্ছে যেন, অন্তত তীব্র কঠোর ধ্বনিগুলি দীর্ঘায়ত আর উচ্চরব হচ্ছে। যেন বাঁধন-ছেড়া, বাঁধ-ভাঙা, তাকে তীব্রভাবে অস্বীকার করা যা তোমাকে স্বাধীন হতে দেয় না, আর ব্যর্থতা যখন ভাগ্যের মতো তার বিষণ্ণতার ঘাটগুলো বেজে উঠছে।" কিন্তু রাজকুমারের পরিণতি কি নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়ামক শক্তিরই জয় ঘোষণা করে? শেষ পর্যন্ত, শুধু 'বেঁচে থাকা'ই কি মানবজীবনের নিয়তি? রাজনগরের রাজকুমার উপন্যাসের শেষে 'সার রাজচন্দ্র' হয়ে সুখে আছেন কি দুঃখে আছেন সে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। হৈমীর সঙ্গে তাঁর রহস্যময় সম্পর্ক, কুমারনারায়ণের রহস্যময় পরিচয়, আরও রহস্যময় এক সোনার মল পরা শেঠানী—সব কিছু নিয়ে উপন্যাসের শেষ অধ্যায় কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করে তা বলা কঠিন। ষোড়শ পরিচ্ছেদে উপন্যাস শেষ হলে কি কোনো ক্ষতি ছিল? ১৮৬১ সালের পর হঠাৎ আমরা এসে উপস্থিত হই ১৮৮৩ সালের শীতকালে। যেখানে সংবাদ হিসাবে রানীর মানসসরোবরে যাত্রা ছাড়া উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর কিছু মেলে না। (রানীর মহাপ্রস্থানযাত্রার রূপকতাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারি না, যেমন বুঝতে পারি না হৈমী কেমন করে নয়নতারার বিকল্প ওয়ে ওঠে)। রাজনগর পর্যন্ত ট্রেন চলছে, ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের পক্ষে আন্দোলন, লালমোহন ঘোষের লনডন যাত্রা, আর্মস অ্যাক্ট আর ভারনাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধতা, ইলবার্ট বিল ও সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর অল ইনডিয়া ন্যাশনাল ফানড তৈরি ইত্যাদি ঘটনা উনিশ শতকের আর-এক যুগের পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু এর সঙ্গে 'নীলদুঁইয়া'র যেমন কোনো যোগ নেই, তেমনি রাজকুমার-নয়নতারা কাহিনীর সঙ্গেও কোনো যোগ নেই। অমিয়ভূষণ নিশ্চয় এই সংযোজন উপন্যাসের পক্ষে অনিবার্য বিবেচনা করেছেন—কুমারনারায়ণ হয়তো সেই যোগসূত্র। কিন্তু গল্প বলা তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যুগের পরিবর্তন, উনিশ শতকের আধুনিকতার স্বরূপ,

ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমাসন্ধান—অন্তত এইভাবেই উপন্যাসটিকে নিয়েছিলুম। সম্ভাবনার দিক থেকে 'রাজনগর' তাই 'নীলভুঁইয়া'র থেকে অনেক বড়ো কিছুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল। 'রাজনগর' সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করে না এমন নয়, কিন্তু পরিণামী চমকটুকুকে কিছুতেই অনিবার্য মনে করতে পারি না। আর এই বিভ্রান্তি শুধু 'রাজনগরে'র ক্ষেত্রে নয়, অমিয়-ভূষণের অধিকাংশ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই এক ধরনের অচরিতার্থতাবোধের জন্ম দেয়। ছোটো মাপের উপন্যাস এদিক থেকে অনেক বেশি লক্ষ্যভেদী, যেমন 'নির্বাস' বা 'মহিষকুড়ার উপকথা'। কিন্তু অমিয়-ভূষণের পরিকল্পিত ট্রিলজি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত 'নীলভুঁইয়া' বা 'রাজনগর' তাঁর অসম্পূর্ণ কীর্তি বলেই পরিগণিত হবে। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক না হওয়ার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন অমিয়ভূষণ যেন তাই করে চলেছেন। অথচ তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে পাঠকের উদাসীন থাকাও সম্ভব নয়। তাই অমিয়ভূষণের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত মাত্র করা গেল—শেষ কথা বলার সময় হয় নি। আমরা 'রাজ-নগরে'র পরবর্তী খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করে রইলুম ॥

## 'এক টুকরো চিঠি'

**আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য বড়ো গল্প**

মুসলিম সমাজের এক স্বল্পশিক্ষিতা অথচ বুদ্ধিমতী মেয়ে শিরিন। চোখঝলসানো রূপ তার গৌরব নয়, অভিশাপ। সেই অভিসম্পাতেই এক চরম সাম্প্রদায়িক-মনোভাবাপন্ন প্রৌঢ় পুরুষের বর্বর প্রভুত্বকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে সে দ্বিতীয়া স্ত্রী হিসেবে। দম্পতির বয়সের ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য, রুচিবিষমতাও অনতিক্রম্য, অতএব দেহমিলনও ধর্ষণেরই নামান্তর। ইতিমধ্যে যখন আগন্তুক এক সমাজসচেতন বিপ্লবপ্রয়াসী যুবকের স্নেহচ্ছায়া সবেমাত্র রমণীটির ব্যক্তিত্বের কোরকোন্মোচনের সহায় হতে শুরু করেছে তখনই সমাজ, সংসার, আদালত নারীকে পর্যুদস্ত করার পাশবিক উল্লাসে সর্বাঙ্গীণ বিরোধিতার আয়ুধ হাতে দাঁড়াল। অসত্যের স্রোতের উজানে খড়কুটোর মতো ভাসতে-ভাসতে সে পুনরায় অবরুদ্ধ হল পুরুষতন্ত্রের সেই অমোঘ শৃঙ্খলে—জীবনের ধ্বস্ত, বিকলাঙ্গ, পাণ্ডুর বিবর্ণতায়।

এই বিষয়টিই বিবৃত হয়েছে আগামী অকটোবর সংখ্যায় প্রকাশিতব্য বড়ো গল্প 'এক টুকরো চিঠি'-তে। লেখক—আবুল বাশার।



# অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

তেরো

'হুঁশিয়ার রাত যখন কালো বোরখায় ঢাকে
দিনকে / আর হুঁশিয়ার যখন স্পষ্টতা
আবছায়া হয়ে যায় / আর হুঁশিয়ার
রাতে যা কিছু ভাবতে থাকো / শয়তান
সে তো অশরীরী / তাই
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার……'

শনশন শব্দ করতে-করতে বাইরে একটা হঠাৎ-আসা বাতাস চলে গেল। তারপর গাছপালায় শব্দ, পানিতে শব্দ, কতক্ষণ ধরে ফিশফিশ, চাপা হাসি বা কান্না—কিংবা এরকম কিছু গোপনীয় মানবিক আর্তি, আর চক্রান্তের আভাস চারদিকে, তখনও পেছনদিকের সবচেয়ে উঁচু তালগাছের বাগড়ায় খড়খড় ঝাঁকুনি, বাদশাহি সড়কের ধারে অশত্থগাছটায় ক্রমাগত পত-পত করে পাতাগুলোর ধারাবাহিক অস্থিরতা, কিছু কি ঘটতে চলেছে, কিছু কি সত্যিই ঘটবে, কান পেতে থাকি। অপেক্ষা করি। আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো চারদিকে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার…! প্রতিটি রাত আসে আর এই হুঁশিয়ারি শুনি। ফারসি 'হুশিয়ার-নামা' কেতাব বুজিয়ে লানটিনের দম কমিয়ে দিলাম। এবার জানালার বাইরেটা কিছু স্পষ্ট হল। জ্যোৎস্না ঝলমল করছে দীঘির জলে। ইচ্ছে হল, শানবাঁধানো নতুন ঘাটে গিয়ে বসি। কিন্তু উঠতে গিয়ে এতক্ষণে কানে এল কারা চাপা গলায় কথা বলছে। হুঁ, কথা নয়, তকরার। নুরু-জ্জামান খুব তর্ক করে বটে। আর বড়োগাজিও তাই। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেওবন্দির সঙ্গে আলিগড়ির বাহাস (তর্ক) চলেছে। সড়কের ধারে ঘোড়াটার একটা রেকাবে পা রেখেও বড়োগাজি বলছেন, যাই বলুন মৌলবিসাহেব, আপনার ওই ঢাকার নবাব মস্ত ভুল করছেন। হ্যাঁ—আশরাফ আতরাফ আমি মানি। তাই বলে বাঙ্গলার আশ-রাফের জবান হবে উরদু, এটা আমি মানি না।

নুরুজ্জামান বলল, আপভি ভুল করছেন গাজিসা'হেব! আতরাফ নেহি, আজলাফ বলিয়ে। বড়োগাজি ঘোড়ার পিঠে বসে বললেন, ঠিক আছে। আজলাফ বলুন কী আতরাফ বলুন, এরা এদেশের লোক। আশরাফরা আরব-পারস্য থেকে এসেছে ঠিকই। কিন্তু এখন তারা এদেশের লোক কি না? মুসলমান যে-দেশে গেছে, সে-দেশের জবানেই কথা বলেছে। এলেম শিখেছে। বড়োগাজি হাসতে লাগলেন।……আর আপনি মওলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেবের কথা বললেন। ওঁরা তো ওহাবিদের মতো এদেশকে 'দারুল হরব্' (শত্রুর দেশ) বলেছেন, এমন-কি এদেশের জুম্মার নামাজ 'নাজায়েজ' (অসিদ্ধ) বলে ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু মওলানা কেরামত আলি সে-ফতোয়া নিয়ে বাহাস করে বলেছেন, এ ফতোয়া দেওয়াই নাজায়েজ! নুরুজ্জামান ঢিট হয়ে গেল। বলল, ফির বাত করেঙ্গে। বহত রাত হয়ে গেল। হোশিয়ারিসে যাইয়ে গাজিসাহাব! বড়োগাজি হঠাৎ তাঁর তলোয়ার বের করে ফেললেন। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে উঠল তলোয়ার। চমকে উঠলাম। বড়োগাজি তলোয়ার দেখিয়ে বললেন, জুলফিকার মৌলবিসাহেব! হজরত আলির তলোয়ার জানবেন! নুরুজ্জামান রাগ করে চলে গেল যেন। হজরত আলির তলোয়ারের নাম ছিল জুলফিকার! বড়োগাজি তাঁর তলোয়ারকে জুলফিকার বলায় নুরুজ্জামানের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবে শিয়ারা শুনলে বড়োগাজির মাথা যেত। বড়োগাজির ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। আমি হেসে ফেলেছিলাম। এই দুই নাদান বুড়বকের কাণ্ডকারখানা দেখে মনেমনে হাসি। কিন্তু আবার সব চুপচাপ। তারপর আবার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার—চারদিক থেকে। মনে মনে বললাম, হে কুলমখলুকাতের মালিক! হে আল্লাহ্! এ বান্দা সবসময় হুঁশিয়ার। দুমাস হল, মসজিদের উলটোদিকে সড়কের এধারে এই 'এবাদতখানা' তৈরি করে দিয়েছে লোকেরা। মসজিদে থাকায় আমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল। কিছুতেই একা থাকা যায় না মসজিদে। দিনভর এত লোক আসে! সে এক জুলুম বটে! শেষে কাতারে-কাতারে লোক হাত লাগিয়ে এবাদতখানা (ভজনালয়) বানিয়ে দিল। এখনও চুনের গন্ধ ঝাঁঝালো। অস্বস্তিকর এই গন্ধটা। আর আশ্চর্য, এই গন্ধটা কেন যেন আমাকে শফিউজ্জামানের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কেন? পুকুরের ঘাটের মাথায় গিয়ে বসে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে হল, হ্যাঁ—খয়রাডাঙার স্কুলবাড়িতে নিজে তাকে ভর্তি করিয়ে দিতে গিয়েছিলাম, তখন স্কুলবাড়িটা সদ্য চুনকাম করা হয়েছিল। ঠিক, ঠিক! শফির জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। দেওয়ানসাহেব নাকি এখনও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বাস করি না। খালি মনে হয়, শয়তানের হাতে আমার ছেলেকে তুলে দিয়েছিলাম। আফশোস! লোকেরা আমার এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেন আমার মেজাজ এমন বদলে গেল, আস্তে শান্তভাবে কথা বলি, কাউকে তম্বি করি না আগের মতো, ঠোঁটে সবসময় হাসি ফুটিয়ে রাখি, এসব কেউ লক্ষ করে না। উঁচুতে উঠে গেলে যেন মানুষের সবটুকু চোখে পড়ে না নীচে থেকে। ওরা ভাবে, আমার ঘরগেরস্থালি নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, আমি অন্য এক মানুষ। অথচ আমার মধ্যে এইসব জিনিস আছে। টিঁকে থেকে গেছে সবকিছুই। সাইদার আহাম্মুকির শোধ নিতে আমি যদি নিকাহ্ করি, লোকের চোখে ছোটো হয়ে পড়ব, এই ভয়। ওরা ভাববে, তাহলে বুজুর্গেরও খাহেস (কামনা-বাসনা) আছে? আরে নাদান বেঅকুফ! পবিত্র কেতাবে বলা হয়েছে, 'চাষী যেমন তার শস্যক্ষেত্রের দিকে যায়, পুরুষ যাবে তার আউরতের দিকে।' পবিত্র কেতাবে আরও আছে: 'আউরত তার পুরুষের খাহেস পূর্ণ করতে সবসময় তৈরি থাকবে, যদি সে রজস্বলা না হয়।' আর ওই যে মুসলমান প্রতিদিন পাঁচবার নমাজের সময় হাত তুলে বলে, 'হে দয়াময়! আমাকে ইহলোক ও পরলোকের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলো







দাও…' সে কথাও ভেবে দেখতে হবে। 'পুরুষ ও নারী পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'—এও পবিত্র কেতাবের কথা। স্রষ্টা আদমকে গড়েছিলেন। সে পুরুষ। তার বাঁ পাজরের হাড় থেকে বিবি 'হবা'কে তৈরি করেছিলেন। কেন? বিবি হবাকে নান্দমগাছের ফল খাওয়ার জন্য শয়তান কুমতলব দিল। সাইদাকে শয়তান হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। তাকে বাঁচানো উচিত। কিন্তু কী করব? কদিন আগেও একবার ইচ্ছে হল, বাড়ি যাই। তারপর হঠাৎ মাথায় এল, জুম্মাবারে আমি খোত্‌বা (শাস্ত্রীয় ভাষণ) পাঠের সময় দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম। 'প্রেরিত পুরুষ একবার পুরো একটি চান্দ্রমাস স্ত্রীদের কাছ থেকে সরে গিয়ে একা মসজিদবাসী ছিলেন। সেই মাসটিতে ঊনতিরিশটি দিন ছিল। প্রেরিত পুরুষের খানদানে আমার জন্ম। কিন্তু আমি আল্লাহ এবং তার প্রেরিত পুরুষের একজন দীন সেবক মাত্র। কাজেই আমার এই সরে থাকার কাল আরও বেশি হওয়া দরকার।'…এই কৈফিয়ত দেওয়া জরুরি ছিল। ভেবেছিলাম প্রেরিত পুরুষের স্ত্রীদের নিয়েও যেমন মুসলমান-নামধারী মোনাফেকরা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি রটাত, তেমন মোনাফেকের তো অভাব নেই। তারা গোপনে কেলেঙ্কারি রটাতে পারে, এই ভেবেই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলাম। তবে যা দেখছি, অনেক উঁচুতে উঠে গেলে নীচের লোকেদের তত নজর চলে না। অথচ আমার কষ্ট। আমার মনে খাহেস। তসবিহ জপে ভুল হয়। তখন মনে পড়েছিল 'হুশিয়ার-নামা' কেতাবটির কথা। আমার চারদিকে তারপর থেকে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার…অথচ রাত নিশুতি হলে সেই হুঁশিয়ারির মধ্যেও চাপা হাসি-কান্নার মানবিক আর্তি ভেসে আসে। কেই বা হাসে, কেই বা কাঁদে চুপিচুপি ভেবে পাই না। বুঝতে পারি না আমার কী করা উচিত। সারারাত ঘুম আসে না দুচোখে। খালি চিন্তা, উটকো সব কথা, গাছ থেকে পাতা পড়ার মতো কিছু খসে পড়ে, দমকা হাওয়া এসে পাতাগুলো ওড়ে, ছত্রভঙ্গ পায়রার ঝাঁকের মতো, আবছা, ফালতু কী সব কথা, খালি কথা আর কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার… পুকুরের পানিতে ঝিলমিল করে জ্যোৎস্না কাঁপছে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার! ওপারের কালো গাছপালার ভেতর গাঢ় ছায়ায় সবে শয়তান নজর রেখেছে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার! আমার গা ছমছম করছিল। আমি এত একা! 'আল্লাহ, আমাকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচাও!' বারকতক এই কথাগুলো আবৃত্তি করলাম। মাঠের দিকে শেয়াল ডেকে উঠল। গ্রামের দিকে কুকুর। তারপর রোঁদে বেরুনো চৌকিদারের হাঁক ভেসে এল হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার…অসহ্য।…

### ভেড়ার পিঠে টুপিপরা জিন

আমার খিদমতগার (সেবক) আলি বখ্‌শ্ সকালের খানা তৈরি করতে-করতে বলল, হুজুরে আলা! একটা কথা শুধোব, তবে ডর লাগে। লোকটি বেজায় কালো, একটু কুঁজো, নীচের একটা দাঁত নেই। তবে না থাকলেও বোঝা যায় না। সারা জীবন দাঁতে মিশি ঘষে সব দাঁতই কালো। মিশি নাপাক (অপবিত্র) বলায় সে ওটা ছেড়েছে। তার বদলে জামালগোটার ডাল ভেঙে আমার মতো দাঁত মাজে। কিন্তু ওই নাপাক কালো রঙ আর ঘুচবে না। আমি ওর দিকে তাকিয়ে এসব কথা ভাবছি। তখন সে একটু বিব্রত হয়ে বলল, তাহলে থাক হুজুর, বলব না। একটু হেসে বললাম, না—তুমি বলো আলি বখ্‌শ্। সে বলল, হজরত! (হজরত সম্বোধন আজকাল সবাই নুরুজ্জামানের দেখাদেখি করে থাকে, তবে আলি বখ্‌শের মুখে শুনে হাসতে লাগলাম। সে আরও ঘাবড়ে গেল।) বলল খাতাহ্ (ত্রুটি) মাফ করবেন হুজুরে আলা। আমি নাদান আদমি। একটু আগে সে বাদশাহি সড়কের দিকে উৎসুক দৃষ্টে তাকাচ্ছিল আর পরোটা সেঁকছিল। সড়কে একপাল ভেড়া যাচ্ছিল। এখান থেকে এখনও

দেখা যাচ্ছে পালটাকে। খুব ধুলো উড়ছে সড়কে। আমার বুঝতে দেরি হল না যে ভেড়া সম্পর্কে তার কী জিজ্ঞাস্য। বললাম, আলি বখ্‌শ্‌! তুমি কি জানতে চাইছ, ভেড়াগুলোর পিঠে আমি জিনদের দেখতে পাচ্ছি কি না? দারুণ চমকে আলি বখ্‌শ্‌ হাঁ করল। ওর জিভটা দেখা যাচ্ছিল। ফের বললাম, আলি বখ্‌শ্‌, আমি জিনগুলোকে দেখতে পাচ্ছি। ওদের মাথায় টুপি আছে। শাদা গোল আর আঁটো টুপি। আলি বখ্‌শ্‌ খুব খুশি হল একথা শুনে। বলল, হজরত! আমার দাদো (পিতামহ) ছিল সামান্য লোক। সে ছিল জিনের রোজা। তার মুখে শোনা কথা। জিন ভেড়ার পিঠে চাপতে ভালোবাসে। বললাম, হ্যাঁ—জিনেরা এটা করে। কেন—বলি শোনো। ওই জিনেরা কমবয়সি। এটা ওদের খেলা। ওই দেখো আলি বখ্‌শ্‌, ঘূর্ণী আসছে। ঘূর্ণীটা ওদের থাবা। এবার দেখো, কী হুলুস্থুল শুরু হল। বাচ্চা জিনেরা পালিয়ে যাচ্ছে ভেড়ার পিঠ থেকে। কয়েক-জনের টুপি খসে পড়েছে। কুড়োচ্ছে!···পরোটার তাওয়া নামিয়ে আলি বখ্‌শ্‌ উঠে দাঁড়াল। আমি হাসতে লাগলাম। সে ব্যাপারটা দেখতে থাকল। তারপর কাঁচুমাচু মুখে ঘুরে বলল, হজরত! সত্যিই একটা মোজেজা দেখালেন দীন বান্দাকে। আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম হঠাৎ। অন্যমনস্কভাবে ঘাটের দরজায় চলে গেলাম। আমি কি সত্যিই ভেড়ার পিঠে টুপি-পরা জিন দেখি? যেন দেখি। সত্যিই এ একটা ধাঁধা। মনে পড়ে গেল, বহু বছর আগে একটা ভীষণ রুক্ষ এলাকার গ্রামে থাকার সময় এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। সে একটা নদী সম্পর্কে।···

### নদী, সিঁদুর, নারী

নদী। বদিউজ্জামানের ধারণায় নদীটি ছিল প্রাচীন। কিন্তু ঠিক কতখানি প্রাচীনতা তার উপযুক্ত, সে-সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিতেন। বিস্তীর্ণ রুক্ষ মাঠে (সেই গ্রামের লোকেরা ছিল অলস, অকর্মণ্য, আড্ডাবাজ) অসংখ্য আব-সদ্‌শ নীচু ঢিবির বন্ধুরতাগুলোকে পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে অতি সুকৌশলী এক লুপ্ত নদীর গতিপথ তাঁর চোখে আশাব্যঞ্জক অস্পষ্টতায় প্রতিবিম্বিত হত এবং তিনি শুধু এটুকুই বুঝতেন, এ হয়তো মরীচিকা নয়—যা তিনি দেখছেন বা দেখতে চান। কেন একটি প্রাচীন নদীর আকাঙ্ক্ষার ভূত তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তিনি জানতেন না। এমন নয় যে মৌলানা বদিউজ্জামান কোনো নদীতীরবর্তী দেশ থেকে উষর, বৃক্ষবিরল ওই গ্রামে নির্বাসিত হয়েছিলেন। নদী সম্পর্কে এ ধরনের মাথাকোটা আদিখ্যেতার অর্থ এও নয় যে, তিনি ইতিহাসবেত্তা ছিলেন, কিংবা জানতেন নদীর সঙ্গে সভ্যতার যোগ আছে। ইসলামি তহজিব-তমদ্দুনের (সভ্যতা-সংস্কৃতি) বাইরে সব সভ্যতাই তো তাঁর কাছে ছিল বর্বরতা এবং ইসলামের অভ্যুদয় মরুমাটিতে! তিনি অপ্রকৃতিস্থ মানুষও ছিলেন না। অথচ ওই বন্ধুর মাঠের শাদা-মাটা লৌকিক বাস্তবতার কোনো সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে ওই অলৌকিক অশ্বডিম্ববৎ পরাবাস্তবতা ছত্রাকের মতো তাঁর সুরমাটানা চোখে গজিয়ে উঠেছিল, এও এক রহস্য। প্রথম দর্শনে, প্রতি বিকেলে দাঁড়িয়ে তাঁর খালি মনে হত, ওইখানে একটি নদী থাকলে ভালো হত, অথবা ওইখানে সত্যিই একটি নদী ছিল। ক্রমশ নদীটি সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যায়। ক্রমে-ক্রমে মগরেবের (সান্ধ্য) নামাজের পর ওই পরাবাস্তবতাটিকে মাঠের সান্ধ্য কুয়াশার ভেতর গর্ত থেকে লেজ টেনে সাপ বের করার মতো টেনে আনতেন, তাকিয়ে থাকতেন আঁকাবাঁকা ছায়া-নদীটির দিকে। প্রায় পৌত্তলিক পটুতায় তাকে উদ্ধারের তাগিদ অনুভব করতেন। তারপর ধূসর গোধূলির পটভূমিতে প্রাতিভাসিক বক্ররেখাটি তাঁকে শিহরিত করত, হঠাৎ আবিষ্কার করতেন সিঁদুরে আভা, আর সেই রেখার কোমলতা যেন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবেন এবং তৎক্ষণাৎ উদ্ধারযোগ্য স্রোতস্বিনীকে







শয়তানের ইন্দ্রজাল ভেবে চোখ বুজে ফেলতেন। অথচ শয়তানের শিল্পকলায় সিঁদুরের উজ্জ্বলতা, কোমলতার কোলাহল, আর স্নিগ্ধতার অনুপুঙ্খময় চাপে যেন বা একটি স্ত্রীলোক—তওবা! নাউজুবিল্লাহ্‌!

### পিরের সাঁকো, আবদুল কুঠোর বউ

সে অবশ্য একটা ব্যর্থতা। পরে—অনেক পরে এক নিশুতি রাতে মনে পড়েছিল, কী ঘটেছে। মরহুম আব্বার (স্বর্গীয় পিতা) সঙ্গে ছেলেবেলায় যেতে-যেতে একটি নদীর ধারে একটি বীভৎস ঘটনা দেখি। একজন হিন্দু স্ত্রীলোককে তার স্বামীর চিতায় বসিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে···হা আল্লাহ্‌! আব্বা আমার চোখে তাঁর পাক (পবিত্র) হাত ঢাকা দিয়ে বলেন, উধার মাত্‌ তাকাও। তার আগেই আমি দেখে নিয়েছি। যুবতীটির সিঁথিতে দগদগে সিঁদুর ছিল। সাইদাকে গল্পটা যখন বলি, সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। সেই সাইদা আজ···আলি বখ্‌শ্‌ এসে বলল, হজরত! আমি খানা তৈরি করলাম। এদিকে এক কাণ্ড দেখুন। মাঝ্‌লা (মেজো) বউবিবি হুজুরের জন্য নাশতা পাঠিয়েছেন। বললাম, তুমি খেয়ে নাও। আলি বখ্‌শ্‌ তবু দাঁড়িয়ে রইল। রাগ করে বললাম, যা বলছি, তাই করো আলি বখ্‌শ্‌। সে গলার ভেতর বলল, মাঝলা মিয়াসায়েব দাঁড়িয়ে আছেন, হজরত! ঘুরে দেখি, লাঠিতে ভর দিয়ে মনিরুজ্জামান এবাদতখানার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে একটা নেংটির মতো গামছাপরা আহুড়-গা ছেলে। সেই রাখাল ছেলেটা! সে আমাকে দেখেই হি-হি করে হাসতে-হাসতে পালিয়ে গেল। ওই ছেলেটা সাইদার গাইগোরুটি চরাতে নিয়ে যায় দেখেছি। সে আমাকে দূর থেকে দেখেই বেআদবি করে—হাসে। একদিন আলি বখ্‌শ্‌ তাড়া করেছিল ওকে। মনিরুজ্জামান তাকাল। তাকে ধমক দিয়ে বললাম, কেন এসব এনেছ? বাড়ি যাও, বলছি! মনিরুজ্জামান গোমড়ামুখে নড়বড় করতে-করতে চলে গেল। তার উদ্দেশে ফের বললাম, বলেছি—তোমরা কেউ আমার এবাদতখানায় খানা পাঠাবে না। তবু কেন এসব কর? এবাদতখানার সীমানায় আমার হুকুম আগে না নিয়ে কারুর আসা বারণ। আলি বখ্‌শ্‌কে খুব বকাবকি করলাম। সে কাঁচুমাচু মুখে তিনদিকঘেরা পাকশালার দিকে চলে গেল। আমার খানা রেশমি কাপড়ে ঢেকে রেখেছে এবাদতখানার বারান্দায়। খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কেনই বা খাব না? আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের জন্য রোজ রুজি মেপে দেন। এ আমার প্রাপ্য। খেতে-খেতে দেখলাম, আলি বখ্‌শ্‌ এদিকে পিঠ রেখে বসে খাচ্ছে। সাইদা কিংবা সত্যিই মেজবউবিবি কী নাশতা পাঠিয়েছে, জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আলি বখ্‌শের খাওয়ার ভঙ্গিতে যেন লুকিয়ে-খাওয়া চোরাগোপ্তা জানোয়ারের আদল, একটি বেড়াল অথবা একটি কুকুর চুপিচুপি ঝোপের আড়ালে কিছু নিয়ে গিয়ে যেভাবে খায়। নাউজুবিল্লাহ্‌! এসব আমি কী ভাবছি? খাওয়া শেষ করেও কতক্ষণ আলি বখ্‌শের খাওয়ার ভঙ্গিটি বিরক্তিকর স্মৃতির মতো আমাকে মাঝে-মাঝে খোঁচা দিচ্ছিল। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ধ্যানে বসলাম। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত। হরিণমারার ছোটো-গাজির দেওয়া দিওয়ান-ই-হাফিজের পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে এলাম তাক থেকে। খুলতেই চোখ গেল:

'জে পাদ্‌শাহ ব জ্বদা ফারিগম ব হমদ্‌ ইল্লাহ্‌,
জুদা এ থাকে দরে দোস্ত্‌ পাদশাহে মন্‌ অস্ত্‌···'

'উপাস্যকে প্রশংসা! বাদশাহ থেকে আমাকে ফারাক করেছেন/দোস্তের দরজার ধুলোই এখন আমার বাদশাহ্‌। মারহাবা! শাবাশ!' কিন্তু কোথায় আমার দোস্ত আর তার দরজা? উপাস্য আল্লাহ কি এ বান্দার দোস্ত হতে পারেন, তাঁর দোস্ত শুধু প্রেরিত পুরুষ। আমি বেআকুফ ফরিদুজ্জামানের মতো সুফি নই, আমার সহোদর ভাই ছিল ফরিদুজ্জামান। সে

নিজেকে বলত 'মাশুক' (প্রেমিক)। তার মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল ছিল। সে গান গাইত। নাউজুবিল্লাহ্। তার চুল কেটে জুতো মেরে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম তার জঙ্গলের আস্তানা থেকে। আমার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ল। আমার সহোদর ছোটো ভাই! কোথায় আছে সে এখন? বেঁচে আছে না মরে গেছে? তাকে সামনে পেলে জেনে নিতাম আল্লাহের মাশুক হওয়ার যোগ্যতা কি প্রেরিত পুরুষ ছাড়া অন্য মানুষের সত্যিই আছে! বারান্দায় কাশির শব্দ। তারপর আলি বখ্শ্ মৃদুস্বরে বলল আনিস্থর রহমান এসেছেন হুজুরের কাছে। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেলাম। এবাদতখানা ঘরের ভেতর কাউকে ঢুকতে দিই না। আনিস্থর নীচে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে প্রথমে 'আস্-সালামু আলায়কুম' সম্ভাষণ করল। সম্ভাষণের জবাব দিলে সে বলল, হজরত! কুঠো আবদুলের বিবিকে নিয়ে ঝামেলা বেধেছে। আবদুল মরার পর সে ডাইন (ডাইনি) হয়েছে। নদীতে পিরের সাঁকোর কাছে রাতে নাঙ্গা (উলঙ্গ) হয়ে চেরাগ জ্বেলে হিঁদুদের মতো পুজো করে। অনেক লোক দেখেছে। এবারে একটা ব্যবস্থা না করলে আমাদের মান থাকে না। হানাফি-গাঁয়ের লোকে তামাশা করে বলে, তোমাদের পিরসাহেবের কুদরতি (লীলামাহাত্ম্য) এবারে দেখাও! হুজুর হজরতে আলা! আপনিই মৌলাহাট ফরাজি-জমাতের সর্দার করেছেন আমাকে। তাই আপনার হুকুম ছাড়া কিছু করব না। আনিস্থরের কথা শুনতে-শুনতে পুকুরের ওপর দিয়ে নজর পাঠিয়ে দিলাম উত্তর-পশ্চিম দিকে দূরে নদীর পুরনো সাঁকোটির দিকে। একটা ঘূর্ণী বয়ে যাচ্ছে সেদিকে। ধুলো, খড়কুটো, ছেঁড়া শুকনো পাতার ঝাঁক—জিনের পাগড়ির মতো। কোনো কালাজিনই হবে! আনিস্থর বলল, কী? ওর প্রশ্নবোধক সম্ভাষণে আস্তে বললাম, আউরতটির নাম কী যেন? আনিস্থর বলল, ইকরা—ইকরাতন!...হুঁ, 'ইকরাতন' মানে আবৃত্তিকারিণী! দূরের ভাঙা পোড়ো সাঁকোর কাছে 'আবৃত্তিকারিণী'কে আবার সেদিন দেখেছিলাম। বললাম, আপনাদের কিছু করতে হবে না আনিস্থর রহমান! আমি দেখছি। বলেই ঘরে ঢুকে গেলাম। বাইরে আনিস্থর আর আলি বখ্শ্ চাপাস্বরে কীসব বলাবলি করতে থাকল। আমি উত্তরের জানালার ধারে গিয়ে আবার কালো সাঁকোর থামগুলো দেখছিলাম। তারপর চমক খেলে গেল। ঝড়বৃষ্টির রাতে সাইদার কাছে গেলে সে আমাকে বলেছিল, ইকরাতনের দিকে আমার নজর পড়েছে। দ্রুত আবৃত্তি করলাম :

'হাসবাঅল্লাহ্ নি'মাল আকিলু আলাল্লাহি তাওয়াকাল্না...'

বালা-মুসিবতে (অস্বাস্থ্যে ও বিপদে) এই পবিত্র বাক্যটি পাঠ করার নিয়ম। সেই ঘূর্ণী হাওয়াটি এখন কালো পুরনো থামগুলিকে ঘিরে ফেলেছে। আমার নজর খুলে যাচ্ছে। একটি কালো থামের গায়ে দগদগে লাল সিঁদুরের ছোপ এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি—নাকি দেখতে চাইছি বলেই দেখছি? আল্লাহ জানেন, আমার চোখের কী ক্ষমতা তিনি দিয়েছেন। কালো থামের মধ্যে চেহারা নিচ্ছে একটি স্ত্রীলোক, নাঙ্গা আউরত, সিঁথিতে সিঁদুর, আর ওই নদী, চিতার মতো দাউদাউ রোদ, আববার পবিত্র হাত আমার চোখ ঢেকে দিক। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি বিগড়ে গেল কি? অথবা প্রকৃতই একটি মোজেজা দর্শন করলাম! বিবি ইকরাতন কি হিন্দু স্ত্রীলোক? তাকে কি আবদুল কুঠো ভাগিয়ে এনেছিল তার স্বামীর চিতা থেকে? আবদুল শুনেছি দুর্ধর্ষ ডাকু ছিল। আমি বেরিয়ে গিয়ে দেখি, আনিস্থর তখনও দাঁড়িয়ে। বললাম ইকরাবিবি কি হিন্দু আউরত ছিল, জানেন? আনিস্থরের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। গাঢ় স্বরে বলল, হজরতে আলা! আপনার অজানা কিছু নেই। আপনি যা বলছেন, তা এবার সত্যি হল। কেননা, আমরা শুনেছি, আবদুল তাকে কোথেকে ভাগিয়ে এনেছিল। এও শুনেছি, সে নাকি হিঁদু আউরত। বাম্ভন (ব্রাহ্মণ) ঘরের বেটি। শুনে শুধু বললাম, দেখছি।...

হাম্মালাতাল্ হাতাব্

পবিত্র কেতাবে সুরা (অধ্যায়) 'লাহাবে' শেষ বাক্যটি আজকাল যখন-তখন মনে ভেসে আসে: 'হাম্মালাতাল্ হাতাব্।' যে-স্ত্রীলোকের কাঁধে খেজুর-পাতার আঁশ দিয়ে তৈরি দড়ি ঝুলছে। প্রেরিত পুরুষের এক আত্মীয় আবু লাহাবের স্ত্রী ছিল কাঠ-কুড়োনি মেয়ে। আবুলাহাব হাত দিয়ে আঘাত করেছিল প্রেরিত পুরুষকে। সে অভিশপ্ত। আর তার কাঠকুড়োনি স্ত্রীও অভিশপ্ত। কারণ সে ছিল কুৎসা-কারিণী। জানালা দিয়ে পুকুরের ওপারে কাঁধে দড়ি-ঝোলা এবং হাতে-কাটারি ইকরাকে দেখে বাক্যটি ভেসে এল। বাক্যটি স্থির হয়ে ভাসছিল চোখের সামনে। তারপর কাঁপতে-কাঁপতে ছত্রখান হয়ে মিলিয়ে গেল। আজকাল আমাকে বাইরে বেরুনোর নেশা এসে জুলুম করে। কিন্তু বেরুলেই ভিড়। জীবনের এতটা সময় আমি যেখানেই থেকেছি, ইচ্ছে-মতো বাইরে ঘুরেছি, কেউ নজর রাখত না বিশেষ। এখন অবস্থা দুর্বিষহ। প্রতিদিনই সড়কে কাতারে-কাতারে লোক এসে জড়ো হয় দোয়া মাঙতে, দোয়া-পড়া জল নিতে, কবচ-মাদুলির আশায়। জুম্মাবারে সে এক অদ্ভুত অবস্থা। হাজার-হাজার মানুষ! গোরুমোষঘোড়ার গাড়ি, পালকি, চারদোলা, দুদোলা—কতরকম বাহন। সেই অসহ্য ভিড় থেকে বাঁচতে এই এবাদতখানা। আজ হঠাৎ পুকুরের ওপারে ওই 'হাম্মালাতুল হাতাব্‌কে দেখে মনে হল, জীবনের কোনো একটা সময়ে প্রয়োজন আসে, জরুরি হয়ে ওঠে, প্রতিটি জায়গার তন্নতন্ন তল্লাস। তল্লাস করো কোন্ জায়গাটিতে তোমার বাসভূমি হওয়া উচিত। কিন্তু কী তাজ্জব, কথাটা এখন কেন ভাবতে বসলাম? এতকাল কি এই কাজটাই করে বেড়াই নি? অথচ দেখো, বদিউজ্জামানের তল্লাসি জিন্দেগানিতে আবার নতুন তল্লাসি পরোয়ানা হাজির। এই এবাদতখানাও তোমার যেন প্রকৃত বাসস্থান নয়। আমার চিন্তা আমাকে ঘুরিয়ে মারছে এবাদতখানার চারদিকে অনেক দূর।

'মায় হুঁ বাদশাহ্ খিতনা দুর্‌তিক জরিপ কারে।
মুঝ্‌কা দখলদারি কৈ না বরবাদ কার শুকে।...'

জানালা বন্ধ করে দিতে গিয়ে পারলাম না। বেরিয়ে গিয়ে পুকুরের ঘাটে দাঁড়ালাম। 'হাম্মালাতুল হাতাব' জঙ্গলের ভেতর থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। আমাকে দেখছে। নীল জ্বলজ্বলে চোখ! ওকে কি তাড়া করব এখন? ময়ূরমুখো আবলুস কাঠের ছড়িটি ছুঁড়ে মারব? পুকুরের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে পারবে কি এই 'আসা' (ছড়ি)? হজরত মুসা—তিনিও এক প্রেরিত পুরুষ, তাঁর আসা দিয়ে নীলদরিয়ার বুকে বাড়ি মেরেছিলেন আর দরিয়া দুভাগ হয়েছিল। আমি কি দেখব চেষ্টা করে? নাউজুবিল্লাহ! ওহাবিরা এসব মোজেজায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা বলেন, আসা কথাটির আরেক মানে 'গোষ্ঠী'। মুসা নীলদরিয়ায় ভাটা পড়ার সময় গোষ্ঠীসহ পালিয়ে গিয়েছিলেন মিশর থেকে কেনান মুলুকে। অথচ ওহাবি হয়েও আমি যেন মোজেজা দেখি। অলৌকিক ঘটনা অনুভব করি। আমাকে আল্লাহ কোন্ রাস্তায় নিয়ে চলেছেন? আমি যে সত্যিই পির বুজুর্গ হয়ে পড়লাম! বুকের ভেতর আর্তনাদ উঠল, আমি মানুষ! আমি মানুষ! নিতান্ত এক মানুষ! আলি বখ্শ্ এসে খবর দিল, সড়কে একজন বিদেশী এসে আমার দর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ভুরু কুঁচকে বললাম, বিদেশী? কে সে? আলি বখ্শ্ বলল, জানি না হুজুর! মাথা ভাঙছে সে। বললাম, নিয়ে এসো। প্রাঙ্গণের কুল-গাছটাকে কাটতে দিইনি। তলায় যেন কাঁটা না পড়ে, আলি বখ্শ্ সাফ করে রেখেছে। সেখানে গিয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম দুরু দুরু বুকে। শফির খবর নিয়ে এসেছে কি? তারপর দেখি, বিদেশী বলতে

আলি বখ্‌শ্‌ একজন হিন্দুকে বুঝিয়েছে। একটু ইতস্তত করে বললাম, ভেতরে আসুন। গায়ে মেরজাই, মাথায় পাগড়ি, পরনে মালকোচ-করা ধুতি, এবং জুতো বাইরে খুলে রেখে তিনি ফটকে ঢুকছিলেন। এসে দুহাত জোড় করে একটু ঝুঁকতেই বললাম, আমাকে গোনাহ্‌গার করবেন না বাবু! আমি মানুষ। মানুষ মাথা নোয়াবে শুধু পরমস্রষ্টার কাছে। বাবুটি একটু বিব্রত হেসে বললেন, আপনি সাধক পুরুষ পিরসাহেব! গোস্তাকি মাফ করবেন। অধীনের নাম গোবিন্দরাম সিংহ। আমি আসছি কৃষ্ণপুর থেকে। বাবু জমিদার অনন্তনারায়ণ ত্রিবেদী আমাকে পাঠিয়েছেন। খত আছে। আস্তে বললাম, পড়ুন, শুনি। মেজরাইয়ের ভেতর থেকে ফারসিতে লেখা খত (পত্র) বাবুটি সুন্দর উচ্চারণে পাঠ করলেন: মাহাত্ম্যপ্রদর্শনকারী অলৌকিক কীর্তিধর পুরুষ, সাধু মুসলমান পিরের প্রতি তাঁর সবিনয় নিবেদন, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জিনের (ভূত) পাল্লায় পড়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস। কারণ সে সম্ভবত আরবি ভাষায় অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। অনন্তনারায়ণ ফারসি জানেন। আরবি শেখা হয় নি সুযোগের অভাবে। তা ছাড়া অধুনা আরবি-ফারসির বদলে বাঙলা-ইংরেজি ভাষার চর্চা দেশে প্রচলিত হয়েছে। মহানুভব মহাত্মা যদি এই 'বান্দা'র প্রতি হুকুম জারি করেন, সে তার জিনগ্রস্ত কন্যাকে নিয়ে সাধুমহাত্মার সমীপে হাজির হবে।···আজকাল হিন্দুরাও আমার কাছে আরজি নিয়ে আসেন। আমি একটু ভেবে বললাম, আলি বখ্‌শ! খতখানি নাও। আর বাবু, আপনি গিয়ে জমিদারবাবুকে বলুন, তিনি যখন খুশি হাজির হতে পারেন। আমি চেষ্টা করে দেখব। গোবিন্দরাম সিংহ আবার করজোড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেলেন। তারপর মনে হল, কেন আমি একথা বললাম বাবুটিকে? আলি বখ্‌শ্‌ খুশিমুখে খতটি হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। নিঃশব্দে হাত বাড়ালে সে খতটি সসম্ভ্রমে দুহাতে তুলে আমাকে দিল। খুলে হাতের লেখা দেখে ভালো লাগল। আমার দাদাজির (পিতামহ) আমলে আংরেজশাহি ফারসি তুলে দিয়েছে। ফারসি ছিল দরবারি ভাষা হিন্দুস্তানে! জুলুমবাজ 'নাসারা' (ন্যাজারেথবাসী প্রেরিত পুরুষ ইসার অনুগামী, কিন্তু ইসলামি মতে পথভ্রষ্ট) হুকুমত। হুঁ, আসলে ফারসি খতখানি আমাকে অনন্তনারায়ণ সম্পর্কে আগ্রহী করেছে। খতখানি হাতে নিয়ে আবার পুকুরের ঘাটে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মনে কেন এত অহংকার আজ? আংরেজশাহির আমলে এখনও একজন হিন্দু ফারসি খত লিখেছেন বলেই কি? মুখ তুলে দেখতে পেলাম সড়কের ধারে অশ্বত্থগাছের তলায় একটি পালকি, কিছু লোক এবং বাবু গোবিন্দরাম বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমি জানি, মেহমানির দাওয়াত দিলে বাবু বিব্রত বোধ করবেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরত (লীলা)! হিন্দু জমিদারবাবুর কন্যা আরবি জবানে কথা বলে—আমার দেখা দরকার, জানা দরকার। জলের দিকে ঘুরে শিউরে উঠলাম। জলের তলায় নীল আসমান ভাঙচুর করে ঢেউ কী খেলা দেখাতে চাইছে আমাকে? হাফিজ আবৃত্তি করলাম:

'আয় শাহান্‌শাহে বুলন্দ্‌ আখতার খুদায়া হিম্মতে
ত-ব-বোসম্‌ হামেচো গর্দুন খাকে আয়বানে শুমা···'

হে উচ্চতম রাজাধিরাজ! করুণা ভিক্ষা চাই যেন ওই আসমানের মতো তোমার উচ্চস্থিত আসনের ধুলো চুম্বন করতে পারি। তারপরই মনে পড়ে গেল, বাচ্চা শফিউজ্জামান তার মাকে হরবখত প্রশ্ন করত, মা, পানির তলায় দুনিয়া আছে? বলো না মা, পানির তলায় সব উলটো কেন? তার মা বলত, উলটো মানুষদের দুনিয়া আছে—তোর আব্বাকে পুছ করিস! শফি আমাকে প্রশ্ন করতে সাহস পেত না। কিন্তু সত্যি বুঝি পানির তলায় উলটো মানুষদের দুনিয়া আছে! খুব মন দিয়ে লক্ষ করতে করতে ঢেউ থেমে গেল। পুকুরের পানির ভেতর খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে চারদিকে মাটি আর বৃক্ষলতার ভেতর একখানে আবিষ্কার করলাম—নাউজুবিল্লাহ! সেই হাম্মালাতুল হাতাব দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কাটারি, কাঁধে রজ্জু। মুখ তুলতেই আবার চোখাচোখি হল। নীল রোশনি ঠিকরে পড়েছে রাতের জানোয়ারের মতো! ডাকলাম, আলি বখ্‌শ! সে এলে বললাম, ওই বেশরম আউরত কে? বেপরদা হয়ে জঙ্গলে ঘুরছে, কে ওই খান্নাস (শয়তানের অনুচরী)? আলি বখ্‌শ্‌ বলল, হজরত! ওই সেই আবদুল কুঠোর বিবি। বললাম, ওকে ডেকে নিয়ে এসো। আলি বখ্‌শ্‌ কুণ্ঠিতভাবে বলল, হুজুরে আলা! ওর লব্‌জ্‌ (কথাবার্তা) খুব খারাপ। গালমন্দ করবে। খুন-খারাপি করতেও ওর ডর নেই। ছড়িটা হাতে নিয়ে পুকুরের দক্ষিণ পাড় হয়ে পুবপাড়ে, তারপর পেছনে পায়ের শব্দে ঘুরে দেখি, আলি বখ্‌শ্‌ আসছে। তাকে ধমক দিয়ে বললাম, এবাদতখানায় যাও বেআকুফ! কুত্তা ঢুকবে! সে মুখ গোমড়া করে ফিরে গেল। উত্তরপাড়ে গিয়ে গিয়ে দেখি, 'হাম্মালাতুল হাতাব' মাঠের দিকে চলেছে। বারবার পিছু ফিরে দেখে নিচ্ছে আমাকে। এইসময় আচানক একটা ঘূর্ণীর মধ্যে পড়ে গিয়ে সে প্রায় নাঙ্গা হবার উপক্রম। আমি চোখ বুজে ফেললাম। নাউজুবিল্লাহ্‌!···

## মাটি, হায় মাটি!

এবাদতখানার দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তরে ডাঙা জমিগুলোর মালিক হরিণমারার হিন্দু জমিদার। নবাবি মহলের ভেতর ছিটমহল। যেন চারদিক থেকে হিন্দুরা হাত বাড়িয়ে মুসলমানের মাটি কবজা করছে, আংরেজ-শাহি মদত দিচ্ছে। ছোটোগাজি বলছিলেন, কতকটা তাই। তবে নবাববাহাদুরও দুব্‌লা হয়ে পড়েছেন। খাজনার দায়ে ছোট-খাটো মহল নিলাম হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু পয়সাওয়ালারা কিনে নিচ্ছে। যখন বললাম, এবাদতখানার চারদিকের মাটি আমার দরকার, কারণ এতিমখানা (অনাথ-আশ্রম) আর মেহমানখানা (অতিথিনিবাস) খুলতে চাই, তখন ছোটোগাজি খুশি হয়ে বললেন, আজই জমিদারবাবুকে গিয়ে বলব। তিনি আপনাকে খাতির-ভক্তি করেন বলে জানি। আমাকে একটা খোয়াব (স্বপ্ন) আচ্ছন্ন করেছে ইদানীং। দূর-দূরান্তর থেকে লোকজন আসে। তাদের থাকার ব্যবস্থা করা উচিত আর এতিমখানায় এতিম—বাপমাহারা অনাথ ছেলেমেয়েরা থাকবে, এলেম শিখবে, ইসলামের খয়েযাওয়া বুনিয়াদ হিন্দুস্তানে আবার মজবুত হবে। বিকেলে বড়োগাজিও এলেন ভাইয়ের কাছে কথাটা শুনে। এই লোকটিকে বোঝা যায় না। ওঁর নাকি খুব আংরেজি এলেম আছে। সবতাতেই লড়াই করতে তৈয়ার। বলল, হজরত! জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণকে মহু (ছোটোগাজি) চেনে না। খুব মতলববাজ লোক সে। মহু কথা বলতে গিয়ে বেইজ্জত হয়েছে। জমিদারবাবু বলেছে, পিরসাহেবের তো এত ভক্ত। আমি পঞ্চান্ন হাজারে কিনেছি। চাঁদা করে দিক ওরা। বিক্রিকবালা করে দেব। তবে পিরসাহেবের খাতির, পাঁচবিঘের মতো মাটি ওর নামে দানপত্র করে দিতে রাজি। চালাকি হজরত! বিলকুল ঝুট। যে-পাঁচবিঘে দানপত্র করবে বলেছে, আমি জানি, সে-মাটি ওর এক জ্ঞাতির। সেই নিয়ে কলকাতার আদালতে মামলা চলছে। বললাম, তাহলে তো মুশকিল! বড়োগাজি বললেন, কিসের মুশকিল হুজুর? আপনার হুকুমে এলাকার তামাম মুসলমান জান কোরবানে তৈয়ার। আমরা লড়াই করে মাটি দখল করব। বললাম, গাজিসাহেব! লড়াই পরে। আগে আমার খত নিয়ে যান জমিদারবাবুর কাছে। আমি ওঁকে সব বুঝিয়ে লিখে দেব। বড়োগাজি একটু অবাক হলেন নিশ্চয়। আমার চালচলনে ইদানিং জঙ্গিভাব নেই আগের মতো, সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি। বড়োগাজি আস্তে বললেন, হজরতের যা ইচ্ছা। ফারসিতে খত লিখে শিলমোহর দেগে দিলাম। বড়োগাজি একটু হেসে

বললেন, আমি ফারসি ভালো পড়তে পারি না। মহু পারে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। নবেন্দুনারায়ণ আমার সঙ্গে কালেজে পড়ত। এমনিতে তত দুষ্ট লোক নয়। কিন্তু মাটি ওর জান। কালেকটার-বাহাদুর প্যাটারসনসাহেব ওকে খুব খাতির করে। বড়োগাজি চলে গেলেন ঘোড়া ছুটিয়ে। আমি এবাদতখানা থেকে বেরিয়ে পুকুরপাড় হয়ে জঙ্গলটার ভেতর ঢুকলাম। কী আশ্চর্য স্তব্ধতা সেখানে! গুমোট গরম পড়েছে। ঝিঁঝিপোকা, পাখপাখালির ডাক সেই স্তব্ধতার ভেতর মিশে যাচ্ছে। আল্লাহর কুদরত! নীচু হয়ে ঝুঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ছড়ির ডগায় খুঁচিয়ে একটু গুঁড়ো মাটি তুলে হাতে নিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই তো সেই মাটি! এ মাটি কোনোদিন এমন করে খুঁটিয়ে দেখিনি—যে-মাটি থেকে আল্লাহ প্রথম পুরুষ আদমকে বানিয়েছিলেন। আমার অজুদে (দেহে) এই মাটি আছে। এই মাটি দিয়ে দুনিয়াও গড়া হয়েছে। আমার মউত হলে আমার অজুদ এই মাটিতে মিশে যাবে। আর ফেরেশতা ইস্রাফিল যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, এই মাটির দুনিয়াও ধ্বংস হয়ে যাবে। হায় এই মাটি! পবিত্র কেতাবে সেদিন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আলকারিয়াহ্‌ ত মালকারিয়াহ্‌···

মহাপ্রলয়! মহাবিপদ! কিসের বিপদ? মহাপ্রলয়ের। শিউরে উঠলাম। বান্দা বদিউজ্জামান! এই দুনিয়ার জন্য তোর এত মায়া, এত স্বপ্ন! প্রচণ্ড হতাশা, তারপর অর্থহীনতা আমাকে পেয়ে বসল। কিন্তু আমি তো কোনোদিন মাটির প্রত্যাশী ছিলাম না! আজ কেন মাটির জন্য এ খাহেস? এতিমখানা, মেহমানখানা, এবাদতখানা! কী অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে কয়েদি হয়ে গেছি বা হতে চলেছি ক্রমে-ক্রমে। অনিত্য মাটির কথা ভেবেই কি এতদিন মুসাফিরের মতো ঠাঁই বদলে-বদলে ঘুরে বেড়াই নি? অথচ আজ আমি এইসব গাছের মতো শেকড় বিঁধিয়ে দাঁড়াতে চাইছি। মাটির গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। একটা কাঠবেড়ালি শুকনো পাতার ভেতর মুখ ঢুকিয়ে কুর-কুর করে কী চিবুচ্ছিল। ওইটুকু আওয়াজে বেচারা দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর শিরশিরে একটা হাওয়া এল মাঠের দিক থেকে। যেন চারপাশে ফিসফিসিয়ে হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!···

নাঙ্গা আবৃত্তিকারিণী

চোখ বুজে তসবিহ্‌ নিয়ে আল্লাহর নাম জপ করছিলাম। তারপর মনে হল আশ্চর্য একটা দৃশ্য আবছা নজর হচ্ছে। একদল ঘোড়সওয়ার, পরনে শাদা পোশাক তাদের, আর ঘোড়াগুলোর গায়ের রঙ নীল, বড় বড় টানা চোখে পুরু সুরমা টানা, আর সওয়ারদের হাতে খোলা তলোয়ার, তারা আমার হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ খুললাম। এ কিসের নমুদ (নিদর্শন) দেখাচ্ছেন আল্লাহ? ওরা কি আসমান থেকে নেমে আসা জিন, আমার মদতের জন্য দাঁড়িয়ে আছে? এ অবস্থায় তসবিহ্‌ নিষ্ফল। লানটিনের দম একটু বাড়িয়ে 'হুঁশিয়ার নামাহ্‌' কেতাবটি রেহেলে রেখে পাতা ওলটাতেই দেখি :

'হুঁশিয়ার পিঙ্গলচক্ষু নারী সম্পর্কে / আর
হুঁশিয়ার ঠোঁটে তার যদি থাকে
তিলচিহ্ন / হুঁশিয়ার যদি সে বারবার
স্থানপরিবর্তন করে / যদি হয় সে
চঞ্চলা মৃদুভাষিণী / উচ্চশ্মশ্রুহীন
তার গমনাগমন·····'

এই সময় বাইরে দূরে আবছা কোলাহল। মুখ তুলে কান পাতলাম। এ রাতে খুব হাওয়া দিচ্ছিল। দুনিয়া জুড়ে একটা অস্থিরতা। গোলমালের আওয়াজ কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট। তারপর আলিবখশের সাড়া পেলাম বারান্দা থেকে। সে খুকখুক করে কাশছিল। কোনো কথা বলার দরকার হলে তার এই অভ্যাস। বন্ধ দরজার বাইরে তার কাশি শুনে ভেতর থেকে ডাকলাম, আলি বখ্‌শ! সে বলল, হজরত! গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে মনে হচ্ছে। বললাম,







ডর নেই তোমার। চুপচাপ শুয়ে থাকো। সে উত্তেজিতভাবে বলল, হুজুর! আওয়াজ এদিকেই আসছে। হুকুম পেলে আমি একটু দেখে আসি। হুকুম দিলাম। গোলমালটা বাদশাহি সড়কের দিকে এগিয়ে আসছে বটে। আমার ঘরের দেওয়ালে আঁটা গোপন সিন্দুকে টাকাকড়ি সোনাদানা আছে। মুরিদদের (শিষ্য) নজরানা। ওই দিয়ে এতিমখানা মেহমানখানার খরচ চালাব। হুঁশিয়ার থাকা দরকার। প্রেরিত পুরুষ স্বয়ং তলোয়ার ধরে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ওহোদের লড়াইয়ে তাঁর পবিত্র দাঁতে আঘাত লেগেছিল। মুসলমান সব সময় তো লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার। কুতুবগঞ্জের গোমস্তা আবদুল কাজির বহুবছর আগে আমাকে তাঁর মরহুম (প্রয়াত) পিতার একটি ঢাল ও তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন। এবাদতখানার দেয়ালে তা টাঙিয়ে রেখেছি। একটু ইতস্তত করে দোয়া পাঠ করলাম :

'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসায়ালুকা ফি সুরুরিহিম অ
নাউজুবিকা মিন শুরুরিহিম···'

দুশমনদমনের দোয়া এটি। ঢাল আর তলোয়ার হাতে নিয়ে দরজা খুলে পা বাড়িয়েছি, কী বা কেউ আমার পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকেই লানটিন বুতিয়ে (নিবিয়ে) দিল। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। হুঁশ এলে ঘুরে গর্জন করতে গিয়ে গলায় কিছু আটকে গেল। না, আল্লাহর কসম, ডর নয়। অন্ধকার ঘর। বাইরে এতক্ষণে একফালি চাঁদের আবছা হলুদ আলো। গোলমালটা এবার উত্তরে পুকুরের ওপাড়ে জঙ্গলের দিকে শোনা যাচ্ছে। আলি বখ্‌শ্‌ ফিরে এল। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, ডাহিন হজরত! ডাহিন! নাঙ্গা হয়ে খোঁড়াপিরের মাজারে মাথায় পিদিম জ্বেলে—বাধা দিয়ে বললাম, ইকরাতন? আলি বখ্‌শ্‌ বলল, জি হুজুর! আমার শরীরে বিজলির চমক। বললাম, আলি বখ্‌শ্‌! পাক কেতাবে লেখা আছে, আল্লাহর ঘর—মসজিদ এবাদতখানা, সবই 'মসজিদুল হারাম!' তার মধ্যে বা চারদিকে শও হাত জমিনে মানুষ হোক কী জানোয়ার, তাকে আঘাত নাজায়েজ (অসিদ্ধ)। আলি বখ্‌শ্‌ কিছু বুঝতে পারল না। শুধু বলল, জি হজরত! তখন বললাম, আলি বখ্‌শ্‌! গিয়ে ওদের বলো, আমার হুকুম—সবাই বাড়ি ফিরে নিদ যাক। আর শোনো, তুমি নিজের বাড়ি গিয়ে তোমার বহিনের (আলি বখ্‌শের বিবি মারা গেছে। আর নিকাহ্‌ করে নি।) একটা শাড়ি নিয়ে এসো। আলি বখ্‌শ্‌! কেউ বা তোমার বহিন কিছু শুধোলে বোলো আমার বারণ আছে জবাব দেওয়া। আর শোনো আলি বখ্‌শ্‌। আমি দুজন জ্বেন (জিন) পাঠিয়ে তোমাদের ডাহিনকে পাকড়ে আনছি। তাকে তওবা পাঠ করিয়ে খাঁটি মুসলমান করব। আলি বখ্‌শের চোখ চাঁদের আলোয় বিস্ময়ে ঝলমল করছিল। সে আবার দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ঘুরে ঘরের ভেতর ঢুকেপড়া 'খান্নাস'টিকে আস্তে বললাম, অ্যাই বেশরম লেড়কি! তোর এত সাহস হল কী করে যে তুই আমার ঘরে ঢুকে পড়লি? চাপা ফোঁপানির মধ্যে সে বলল, ওরা আমাকে মেরে ফেলত। একটু হেসে বললাম, তুই ডাহিন আওরত? নাঙ্গা হয়ে মাথায় চেরাগ রেখে নাচ করছিলি? শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জবাব এল, আমি থানে ওষুধ তুলতে গিয়েছিলাম।·· নাঙ্গা হয়ে কেন?·· নৈলে ওষুধে ফল হয় না।···বুড়বক খরিস! কিসের ওষুধ তুলতে গিয়েছিলি?···রূপমারির একটা মেয়ের অসুখ। দুকাঠা চাল দেবে বলেছিল।···হাসতে-হাসতে বললাম, লোককে ঠকিয়ে ধোকা দিয়ে রোজগার করিস! ফুঁপিয়ে উঠে বলল, পোড়া পেটের দায়, পিরসাহেব! ···তুই হিন্দু আউরত ছিলিস?·· এবার না-জবাব হয়ে কাঁদতে শুরু করল। ধমক দিয়ে বললাম, চুপ! নাদান বেশরম কাঁহেকা। তবু সে কাঁদতে থাকল। একটু ভেবে বললাম, আলি বখ্‌শ্‌ কাপড় আনতে গেছে। তোকে ওর সঙ্গে হরিণমারায় ছোটোগাজির বাড়ি পাঠিয়ে দেব। সেখানে থাকবি। রাজি?···জি হ্যাঁ। ···তোকে তওবা করতে হবে আগে। তুই কলমা

জানিস? আবদুল তোকে মুসলমান করেছিল তো? ...জি হ্যাঁ।...বাইরের গোলমাল থেমে গেছে। আলি বখ্‌শ্‌ আসতে একটু দেরি হবে। বললাম, আমি যা বলছি, বল্‌। না বললে মুশকিলে পড়বি। বল্‌—কল্‌মা শাহাদত:

'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, মহম্মদর্‌ রসুলাল্লাহ্‌...'

আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই, মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ। আশ্চর্য, আশ্চর্য, এবং আশ্চর্য! সে চমৎকার আবৃত্তি করল কান্নাজড়ানো গলায়। বললাম, মারহাবা! শাবাশ! এত সুন্দর তোর লব্‌জ্‌! সে আস্তে বলল, রুকু আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল।...আমার মেজবউ-বিবি?...জি হ্যাঁ।...মারহাবা! মারহাবা! অ্যাই লেড়কি! তোর নামের মানে কী জানিস? যে আউরত মুখস্থ বলতে পারে। কী মুখস্থ বলতে পারে—না আল্লাহর কথা, রসুলের কথা। আর ইক্‌রাতনন্নেসা! তোর কি মনে পড়ে, আমার সঙ্গে নদীর ধারে তকরার করেছিলি?...জি হ্যাঁ।...এইসময় আলি বখ্‌শ্‌ হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়ল। তাকে চাপা স্বরে বললাম, আমার জেন (জিন) মেয়েটাকে ধরে এনে বেঁধে রেখেছে, আলি বখ্‌শ্‌! তার হাত থেকে কাপড়টা নিয়ে অন্ধকারে ঘরের ভেতর ছুড়ে ফেললাম। দরজা বন্ধ করে জেনদের উদ্দেশে বললাম, ওকে তোমরা কাপড় পরিয়ে দাও। আলি বখ্‌শ্‌ জড়োসড়ো হয়ে বারান্দায় বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে আপনমনে বলল, সবই হুজুরের কেরামতি!...

আরও একটি ব্যর্থতা

'হুশিয়ারনামাহ্‌' কেতাবে যেমতো লিপিবদ্ধ ছিল। ইকরার চোখ দুটি সত্যিই ছিল পিঙ্গলবর্ণ—গ্রামে যাদের 'কয়রাচোখি' মেয়ে বলা হত, বেড়ালের মতো চোখ। চঞ্চলও ছিল সে। আর তার ঠোঁটে সত্যিই তিল ছিল। কথা কম বলত। দ্রুত স্থান পরিবর্তন করত। সেরাত্রে হরিণমারা যাবার পথে বেচারা কম-জোর আলি বখ্‌শ্‌কে ধাক্কা মেরে কাঁদরের জলে ফেলে দিয়ে সে পালিয়ে যায়। আলি বখ্‌শ্‌ হুজুরের ভয়ে একটা গল্প বানিয়েছিল। কাঁদরের কাছে যেতেই একদল কালা জিন তাকে ঘিরে ধরে। তাকে প্রহার করে। প্রমাণ হিসেবে সে গায়ের ছেঁড়া ফতুয়া এবং কপালে, হাতে ও পায়ে ছড়ে-যাওয়া ক্ষতচিহ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু আগাগোড়া একটি নাটকীয় ঘটনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'বহুপিরের' এই ছোট্ট পরাজয়ের চেয়ে জিনদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুসাব্যস্ত হয়। তবে বদিউজ্জামানের জীবনে এও আরেকটি বড় ব্যর্থতা—তাঁর নিজের কাছে। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি ব্রাহ্মণী নদীর সেই প্রাচীন সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়ে দুঃখে ব্যর্থতায় ক্রোধে অভিমানে ক্ষিপ্ত হতেন। তারপর সাঁকোর পাথরের থামগুলো গুঁড়িয়ে ফেলার ফতোয়া জারি করেন। পুরনো সাঁকোটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অথচ এবাদতখানায় বসে, অথবা পুকুরপাড়ে নিশুতি রাতে দাঁড়িয়ে বদিউজ্জামান অবিকল সিঁদুরের ছোপমাখা থাম দেখতে-দেখতে এক নাঙ্গা আউরতকে দেখে চোখ বুজে ফেলতেন। বিড়বিড় করে পাঠ করতেন: আল্লাহ্‌! শয়তানের জাদু থেকে আমাকে বাঁচাও। আসলে জীবনের অনিবার্য স্পষ্টতাগুলো নিজেকে উঁচুতে তুলে রাখার দরুন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে।...

(ক্রমশ)

---

ড. ভবতোষ দত্ত-রচিত **'শিক্ষিত বেকার'** প্রবন্ধে সমস্ত পরিসংখ্যান পরিকল্পনা কমিশন-প্রকাশিত 'সেভেনথ ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান', ভারত সরকার-প্রকাশিত ইকনমিক সারভে ১৯৮৪-৮৫' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত 'ইকনমিক রিভিউ ১৯৮৫-৮৬' থেকে নেওয়া।



# যন্ত্রবিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং তৃতীয় সংস্কৃতি

গুরুদাস ভট্টাচার্য

## ১. দুই সংস্কৃতি?

১৯৫৯ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্লস স্নো যে-বিখ্যাত রীড বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, তার শিরোনাম ছিল "টু কালচার্‌স্‌"। নানা কারণে 'দুই সংস্কৃতি' বুদ্ধিজীবী-মহলে এমন ঝড় তুলেছিল যে আত্মপক্ষ-সমর্থনে বক্তাকে মূল ভাষণের সঙ্গে একটি সংযোজনও প্রকাশ করতে হয়েছিল।

কলা বনাম বিজ্ঞানের এই সম্মুখ-বিতর্ক নতুন নয়। ১৮২৮ সালে নবপর্যায়ে এর সূত্রপাত করেছিলেন বিখ্যাত রাগবি স্কুলের প্রধান শিক্ষক (ম্যাথ্যু আরনল্‌ডের পিতা) টমাস আরনল্‌ড্‌ বিদ্যালয়-সিলেবাসে ইতিহাস এবং ভাষার সঙ্গে গণিতকেও স্থান দিয়ে। এর উলটোটা ঘটল ১৮৮০ পয়লা অকটোবর জশুয়া ম্যাসন কলেজের (পরে, য়ুনিভার-সিটি অব বার্কিংহাম) দ্বারোদ্‌ঘাটনে; প্রখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস হাক্‌স্‌লে ঘোষণা করলেন: 'বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যপাঠ সময়ের অপ-ব্যবহার মাত্র। শুধু সাহিত্য পড়ে যেমন, তেমনি শুধু বিজ্ঞান পড়েই যে-কেউ 'কালচার্ড' হতে পারে, তার জন্যে গ্রীক-লাতিনের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই।' প্রতিবাদ করলেন ম্যাথ্যু আরনল্‌ড্‌ 'কালচার অ্যানড অ্যানারকি' গ্রন্থে, সাহিত্যপাঠের দৃষ্টান্ত দিলেন খোদ বিজ্ঞানীদের জীবনী থেকে, শিক্ষা কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে উভয়কে আনুপাতিক হারে অবশ্যপাঠ্য করার প্রস্তাব জানালেন। পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক জমে উঠতে লাগল। রীড বক্তৃতা তারই একটি ক্রমিক স্ফুলিঙ্গ।

একই সঙ্গে গল্পলেখক আর বিজ্ঞানবিদ চার্লস স্নো, দুই মহলেই সমান গতায়াত, উভয়ের গোত্র-বিচার করেন নি, বলেছেন কলা আর বিজ্ঞানের অনাত্মীয়তার কথা (এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বিচ্ছেদ-প্রসঙ্গও)। তাঁর মতে, 'দুজনের মধ্যে একটা "জন্মগত বিরোধ" রয়েছে; যে কারণে

এপক্ষ বলে "যন্ত্র ও ল্যবের বাইরে বিজ্ঞানী মানুষের কথা ভাবে না" আর ওপক্ষ বলে "সাহিত্য ও কলা-বিদ্যা কল্পনাজগতের বাইরে বাস্তবকে চেনে না।" কলাবিদগণ যন্ত্রবিজ্ঞানের সুফল ভোগ করছেন অথচ (একমাত্র ইবসেন বাদ আর) কেউই শিল্পবিপ্লবকে ঠিকমতো বোঝেন নি, যদিচ এঁরাই 'বুদ্ধিজীবী' বলে মান্যগণ্য। ফল হয়েছে: 'ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সঙ্গে এই বিপ্লবের সুষ্ঠু মিলন হতে পারে নি যার পরিণামে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে সমাজে সংস্কৃতিতে দেশে-দেশে মানুষে-মানুষে।' প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল বিদ্বৎ-সমাজ। ১৯৬২ রিচমন্ড বক্তৃতায় এফ. আর. লেভীস সোজা আঘাত করলেন: "স্নো কিছু জানেন না, জানেন না যে তাও জানেন না।" পত্রিকা 'কমেনটারি' এবং 'এনকাউনটার'-এ লাওনেল ট্রিনিং এবং রবার্ট ওপেনহাইমার এবং 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' সংকলনগ্রন্থে অলড্যাস হাকসলে প্রমুখ প্রাবন্ধিকগণ শানিত আক্রমণ করলেন: 'স্নো কালচার-এর যথাযথ ব্যাখ্যা করেন নি, বুদ্ধিজীবী-র ভুল সংজ্ঞা দিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির চরিত্র বুঝতে পারেন নি, বোঝেন নি যে কলা আর বিজ্ঞানকে মেলানো যায় মেলাতে হবে, তবেই হবে মানবসভ্যতার অগ্রগতি। চরমপন্থীরা কিন্তু এহেন সমীকরণে বিশ্বাসী নন। তাই হেনরি অ্যাডামস যখন লেখেন "যন্ত্রবিজ্ঞান অনৈক্যের দূত" তখন হ্যালডেন বললেন 'ধ্রুপদী সাহিত্য অনুশীলনের তুলনায় বিজ্ঞানের ইতিহাস অনুধাবন উপাদেয়তর' এবং জ্যাঁ দানিয়ে বৃ: 'প্রযুক্তির চেয়ে সুন্দরতর আর কিছু নেই।'

বিতণ্ডা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; একই প্রশ্ন উঠেছে পৃথিবীর নানা মহাদ্বীপে; পরাধীন ভারতেও, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের যন্ত্র-বিরোধিতায়। তার কারণ: ইতিহাসের সুবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে কলা আর বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধটি অত্যন্ত দ্বন্দ্বজটিল, লুই মামফোর্ডের ভাষায় "প্যারাডক্স্ অব হিস্ট্রি" যার সুষ্ঠু সমাধানের ওপর আমাদের বর্তমানই শুধু নয়, ভবিষ্যৎ শুভাশুভও একান্তভাবে নির্ভরশীল।

## ২. বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা

মানুষের কর্মে আর মননে, যেমন ধর্মের আর শিল্পের, তেমনি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির দান সেই প্রত্নতাত্ত্বিক যুগ থেকেই—যেদিন আদিমানব প্রথম হাতিয়ার ধরতে শিখল, আগুন জ্বালাতে শিখল, উচ্চারণ করতে শিখল ভাষা। অবশ্য তখনও তার বিজ্ঞানচেতনা জাগে নি, যেমন জাগে নি ধর্ম আর শিল্পচেতনাও। বাস্তব কলা-কৌশল, তার সঙ্গে জাদু আর মীথ। পরিবেশের মোকাবিলায় তৈরি হাতিয়ার, তার দেহে আর্টের অলংকার, অন্তরে দৈবীভাবনা। যে-শলাকা দিয়ে পশুশিকার, নর-হত্যা, তাই দিয়েই গুহাচিত্র; যে-চামড়া দিয়ে দেহ-রক্ষা, তাই দিয়েই পুজোর বাজনা। জাদুও একটি ফলিত বিজ্ঞান, তথা প্রযুক্তি, নাচগানকথাআলপনাদি 'টুল্স্' বা হাতিয়ার। বন কেটে বসত, নদী বেঁধে চাষ, পশু-বশীকরণ—সর্বকর্মে। বস্তুত, হলকর্ষণ বীজবপন গৃহ-প্রবেশ যাত্রাসিদ্ধি বাণিজ্য খেলাধুলা আলপনা গর্ভাধান পুংসবন বিদ্যারম্ভ উপনয়ন বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত পুরশ্চরণ পূজার্চনা আকাশলিপি অদৃষ্ট-লিপি কালগণনা শব্দসুরছন্দেরমাত্রাগণনা—মানবিক তৎপরতার তাবৎ ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি-শিল্পকলা-জাদু তথা কারিগর-ক্ষত্রপ-পুরোহিত ত্রয়ীর সহযোগিতা কত নিবিড় ছিল, তার প্রমাণ আজও পাওয়া যাবে 'সংক্রান্তির ব্রাহ্মণ'-লাঞ্ছিত হিন্দু পাঁজিতে। তার সর্বোত্তম দৃষ্টান্তস্থল আদিম কৃত্য: বৃষ্টি আনার অনুষ্ঠান, শিকারে বা যুদ্ধে যাবার আগে তাদের প্রাক্-অভিনয় বা কৃষিকৃত্যগুলি—যেখানে এরা সবাই মিলেমিশে এক হয়েছিল এক আধারে এবং যেখান থেকে ক্রমশ স্বতন্ত্র হয়ে যেতে লাগল ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনিবার্যতায়। জাদু আর মীথ ভেঙে জন্ম নিল ধ্রুপদী বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্পসাহিত্য। দ্বিধা-বহুধা-বিভক্ত সমাজে, জীবনসংগ্রাম তথা বহিঃপ্রকৃতি







নয়, এদের যোগ এখন অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে, চলন-বলন অভিজাত; দর্শনচিন্তা ন্যায়শাস্ত্রীয়, শিল্পতত্ত্ব বিশিষ্ট, ধর্ম সুবিহিত। এই সময় থেকেই বিজ্ঞান এবং মানবসভ্যতার সম্বন্ধ দ্বান্দ্বিক হয়ে উঠতে থাকে—আত্মীয়দের সাথে একই সঙ্গে যোগ আর বিয়োগ।

ফলিত এবং তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের যোগে বস্তুবাদী দর্শনের উদ্‌গাতা আয়োনিয়ানরা, আবার 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান' ও 'বিশুদ্ধ শিল্প'র প্রবক্তাও। মিশরের পুরোহিত টেকনোক্রাটও; তারাই পিরামিড গড়েছে 'মেগামেশিন' বা বিপুল মনুষ্যশক্তির সহায়ে, চীন যেমন তার প্রাচীর। ধর্ম-শিল্প-প্রযুক্তির ত্রিবেণী-সংগম গ্রীক থিয়েটার। বিজ্ঞানচর্চাকে মননশীলতায় উন্নীত করে এথেনসের অসাধারণ পাণ্ডিত্য। প্লেতোর অকাদেমীর দরজায় নোটিশ ঝুলত "জ্যামিতি-অজ্ঞদের প্রবেশ নিষেধ"। আরিসততলের 'পোএ-টিক্স্'-এর ভিত্তি তাঁর 'মেটাফিজিক্স্,' তার ভিত্তি তাঁর জীববিজ্ঞানচর্চা। কিন্তু হায়, এসবই ছিল নির্ভেজাল 'মানসিক ব্যায়াম'। যোগ ছিল না কারিগরি বিদ্যার সঙ্গে যার দৌলতে গ্রীকদের অত রবরবা। সেকাজ করত তারা যাদের সক্রেতিস নাম দিয়েছিলেন "ছোটোলোক"। রোমেও তাই, দাসেরাই ছিল কারিগর-শিল্পী, ওপরতলায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমর-নীতি ইতিহাস আইন সাহিত্য বাগ্মিতা। তারই মাঝখানে দর্শন-বিজ্ঞান-কাব্য-রচয়িতা লুক্রেটিয়াস এবং বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্লিনি যিনি জ্বলন্ত বিসু-ভিয়াসের উৎস-সন্ধানে সেই আগুনেই প্রাণ দেন। ধ্রুপদী ভারতেও জনকের মতো রাজর্ষি, একাধারে শাসক-কর্ষক-ধর্মোপদেশক; ঋষি-আশ্রমে ৬৪ কলা-বিদ্যার চর্চা; তথাপি বিশ্বকর্মা তৃতীয় কি চতুর্থ সারির দেবতা কি দেবতা নন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অর্ধ-পশু।

একটি-দুটি নয়, যাবতীয় মানুষী বিদ্যার এবং তৎপরতার যোগেই যে সভ্যতার উদ্বর্তন ঘটে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইসলামি দুনিয়ায় আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, কারিগরি বিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগে, শিল্পের উজ্জীবনে, সুফী সাধনায়ও। সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিরাটকায় অজস্র সব লাইব্রেরি গ্রীক-ভারতীয় দর্শনের-বিজ্ঞানেরও সুরক্ষিত ভাণ্ডার, কর্ডোভা আন্ত-র্জাতিক শিল্পকেন্দ্র, বাগদাদ মধ্যযুগের পারী। খোদ পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরিসততলীয় বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন যখন নিষিদ্ধ, তখন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইবন রুস্‌দ্। কবি আর বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম, চিকিৎসক আর সংগীতবিদ ইবন সিনা, ভারততত্ত্ব-প্রণেতা আলবেরুনী প্রভৃতি এই মুক্তবুদ্ধির এক-এক দিগ্‌দর্শন। অন্যতম নিদর্শন: মুসলমান শিল্পী-কর্তৃক বাইবেল-কাহিনীর আন্তরিক চিত্ররূপদান। অন্যপক্ষে, এই যোগবিয়োগে পর্যবসিত হলে যে সভ্যতার সমূহ পতন ঘটে, তারও জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত ইসলামি দুনিয়া যখন অন্ধবিশ্বাসের অতিচাপে স্বাধীন চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ ত্রস্ত দমিত, এতদিনকার প্রাণান্ত অনুশীলনের স্বর্ণফসল গিয়ে ওঠে জাগর য়োরোপের ঘরেঘরে। চীন এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও—ঝুড়ি-চীনেমাটি-ব্রোন্জের কাজ, সোনা-পাথরের কাজ, গ্রোটেস্‌ক্ মূর্তি-ডিজাইন, পুরোহিতের শবব্যবচ্ছেদে দক্ষতা, দেবস্থানকেন্দ্রিক নগর-পরিকল্পনা বা একই গৃহ দেবমন্দির-মানমন্দির-সেনাছাউনি—কারু আর চারু আর ধর্মের ঘনিষ্ঠতার ফসল, তদভাবে ধ্বস্ত পরিত্যক্ত লুপ্তপ্রায় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনমাত্র।

মিশর-গ্রীসের মন্দিরে একদা যন্ত্রের প্রয়োগ হত অলৌকিক প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে; মধ্যযুগ-য়োরোপের 'ঈশ্বরের দুর্গ' গির্জাতেও হত—অবিশ্বাসীদের শায়েস্তা করতে। ঘরোয়া কাজেও মেশিন ব্যবহৃত হত; 'লজ' আর 'গিল্ড' থেকে ভাড়াকরা কারিগর আসত, যাজকরা নিজেরাও চালাত। হাতের কাজ শেখানো, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, গির্জা-ধর্মগ্রন্থ-পুজাসামগ্রী লেখন-অলংকরণ ইত্যাদি শিল্পকর্ম অব্যাহত ছিল। আবার এই খ্রীষ্টানরাই ধ্বংস করে আলেকজান্দ্রিয়ার অমূল্য

গ্রন্থাগার, বিদুষী গণিতজ্ঞা হাইপেসিয়াকে হত্যা করে, বন্ধ করে দেয় এথেন্‌স্‌ অকাদেমী। চার্চের ফরমান ছিল: স্বাধীন চিন্তা, বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রযুক্তি "শয়তানের অবদান···নরকের বাহন···জঘন্য বৃত্তি।" যা-কিছু শাস্ত্রবিরোধী, নির্বিচারে সমর্পিত 'পবিত্র অগ্নি'তে; ব্রুনো-গ্যালিলিওর নিগ্রহ তার ছুটিমাত্র দৃষ্টান্ত; বাকি ইতিহাস আছে গির্জা এবং গুপ্তসমিতিগুলির দলিল-দস্তাবেজে। অপরূপ এই দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ, যা থেকে রূপ নিল একপিঠে টম্যাস অ্যাকুইনাসের খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান, উলটো পিঠে রজার বেকনের বৈজ্ঞানিক 'ওপাস'।

অতঃপর ১৪শ-১৫শ শতকের রেনেশাঁস: দেশ আবিষ্কার এবং তার উপযোগ, কারিগরি আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগ, প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি, যন্ত্রের বিপুল সহযোগিতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রসার, সাহিত্যশিল্পদর্শনে আধুনিকতা; তৎপরতার সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাট ব্যাপক পরিবর্তন, রুদ্ধ জীবনে গতিশীলতা, মানস আর মননের অবাধ পাখামেলা: "মানবজাতির সার্বিক উন্নতির অমেয় সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল" (বিজ্ঞানের ইতিহাস ২য় খণ্ড)। বিজ্ঞানের বিপ্লব, বাণিজ্যিক বিপ্লব, শেষে ১৮শ-১৯শ শতকের শিল্পবিপ্লব—'মানবসভ্যতার ইতিহাসে এতবড় বিপ্লব আর আসে নি' বলে যাকে চিহ্নিত করেছিলেন জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাধিনায়ক উ থান্ট্—হাই ক্যাপিট্যাল হাই টেকনোলজি, সংগঠিত শিল্পোদ্যোগ-কলকারখানা-ব্যারাক, সুশৃঙ্খলিত শ্রমবিভাগ-কর্মপদ্ধতি, প্ল্যান প্রোগ্রাম পাবলিসিটি মারকেট রিসারচ ম্যানেজমেনট; য়োরোপ জুড়ে নতুন-নতুন তৎপরতা, মানসিকতা-সমাজবিন্যাস-রাষ্ট্রগঠন, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন যাকে বলে অষ্টবজ্রসম্মেলন! ধর্মও তার মিলনকামী। অথচ আশ্চর্যের কথা, এই পরিবর্তন উজ্জীবন, বিপ্লবের এই মৌল চরিত্র, তার সর্বতোমুখী রূপটি অধিকাংশ মনীষী ধরতে পারেন নি। কেউ বলেছেন 'জয় যন্ত্রের জয়', কেউ 'বাণিজ্যেতে যাবই আমি যাবই', কেউ-বা 'আমি নামব মহাকাব্য সংরচনে'; এবং ভ্যাটিক্যানও: 'প্রকৃতির সম্পদ ভোগ করো, প্রভুর ইচ্ছায়, দায়িত্বের সঙ্গে।' দায়িত্বপালন নয়, ভোগই করেছে একমুঠো 'উঁচকপালে অভিজাত'। জনতাও অসহমত—গিলডের প্রশ্রয়ে তারা উপদ্রব শুরু করে লাইডেনের কারখানায়। জরমনিতে ভেঙে দেয় স্টীমলনচ, ইংলনডে স্বয়ংচালিত তাঁত আর করাতকল। যে-ভয় তারা করেছিল, মুখব্যাদান করল পর-কালে ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিক্‌স্‌-রোবোটিক্‌স্‌-এর আস্ফালনে: বেকারি দারিদ্র্য শিক্ষা-হীনতা, দুর্নীতি কুরীতি কদাচার, শোষণ প্রতিযোগিতা যান্ত্রিকতা; যাযাবর জীবন, বস্তির ভিড়, নষ্ট মূল্যবোধ। টেনশন সর্বত্র সর্বদা। তার প্রতিক্রিয়া সংস্কৃতির সর্বাঙ্গে—দাদাইজম থেকে নিহিলিজম থেকে অপ্‌কালচারে।

"ইট্‌স্‌ অ' ম্যাড ম্যাড ম্যাড ওয়র্লড"; মূল ধুন, স্পেংগলারের বীক্ষণে, "মনুষ্যত্বের অবনমন-আত্মহনন-নিঃশেষ বিলুপ্তি।" কিন্তু এপেনহাইমারের দৃষ্টিতে, 'ইট্‌স্‌ অ' নিউ ওয়র্লড': "নতুন জগৎ, নতুন মানুষ, উন্নত আর আরামপ্রদ জীবন, পরিবর্তিত গোষ্ঠীচেতনা আর সমাজচেতনা, নিহত অন্ধতা-গোঁড়ামি-অন্ধকার, যুক্তিসিদ্ধ মুক্তবুদ্ধির জয়।" পরস্পরবিরোধী পরস্পর-বিচ্ছেদী দুটি নিখুঁত সমপদী রেখা!

### ৩. ইতি ইতি নেতি নেতি

যন্ত্রযুগ মন্ত্রণার, যন্ত্রযুগ যন্ত্রণার। অনুমান করতে পেরেছিলেন দ্য ভিন্‌চি। স্বপ্ন দেখেছিলেন কার-ফোন-ফোনোগ্রাফের ("যখন মানুষ না নড়েও চলবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবে···") এবং শুনতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ-মানবের কণ্ঠনিঃসৃত আতঙ্ক-মেলানো অজস্র কান্না ("হায় কত দুর্ভাগা মাবাপ হারাবে তাদের সন্তানদের, কত অভাগিনী নারী হারাবে তাদের জীবনসাথী!···") যার জবাব আজকের মারণাস্ত্রসমূহ। তুলনীয়: ফ্রান্সিস বেকনের দৈববাণী







"প্রযুক্তিবিদ্যায়ই আমাদের ভবিষ্যৎ" এবং বাটলারের যন্ত্রভাঙার আহ্বান, হার্টলে গ্র্যাটানের 'ইনডাসট্রিয়াল সভ্যতা'র ব্লুপ্রিন্‌ট্‌, উলটোপিঠে সেইডেনবারগের সাবধানবাণী "যন্ত্রকে থামাও, নতুবা আনকোরা 'পোস্ট্‌-হিস্‌টরিক ম্যান' এল ব'লে!" পরিস্থিত যত জটিল হচ্ছে, মারাত্মক হয়ে উঠছে বাম-দক্ষিণ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শিবিরের বিপ্রতীপ অবস্থান। তথ্যে তত্ত্বে সমান সজ্জিত দু পক্ষই।

ইতিবাদীদের বক্তব্য: (ক) বিজ্ঞান মানবমুখী। তার লক্ষ্য: পৃথিবীকে সুন্দর জীবনকে উপভোগ্য করে তোলা। তার কাজ: পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং তাকে বাস্তবে প্রয়োগ, প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান এবং তার সদ্ব্যবহার, যন্ত্রের এবং পদ্ধতির সহায়ে জাতীয় সমৃদ্ধি। তার ধর্ম: নিত্যনতুন আবিষ্কার—বিশ্ববিধানের, তন্নিষ্ঠ তত্ত্বের, তদনুযায়ী হাতিয়ারের। যার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নীত, মানুষের দক্ষতা-বৃদ্ধি, সুলভ হচ্ছে যন্ত্র—ঘরে-ঘরে হীটার কুলার ওয়াশার মিকশার ফ্রীজ মায় পারসোন্যাল কমপ্যুটর ইস্তক। শিক্ষায় নববিধান, চিকিৎসায় নবরীতি, খেলাধুলায় অগ্রসৃতি, যোগাযোগবৃদ্ধি, প্রকৃতি-পরিবেশ মানুষ নিকটতর। (খ) হাজার-হাজার বছর অজ্ঞতার আতিশয্যে বাইরে আর ভেতরে মানুষ যত ক্ষত আর আবর্জনা জমিয়ে তুলেছে, যত দোষ আর দূষণ, সেসবের নিরাময় আর সংশোধন একমাত্র বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যেই হতে পারে, মহাকাশ-গবেষণা তারই দিশারি। (গ) বিজ্ঞানের রীতিনীতি মানুষকে দেয় বাস্তব এবং ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রাকৃতিক নিয়মে শ্রদ্ধা, বস্তু এবং কর্মে নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ এবং এক অভাবিত ডাইনামিজম—সব অজ্ঞতা কুসংস্কার নিশ্চেষ্টতা থেকে মুক্ত এক অপরাজেয় শক্তি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসার অনুশীলন মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে জিজ্ঞাসা, বিচারবুদ্ধি, ঐতিহাসিক জ্ঞান যা ব্যক্তিকে সমাজকে সংস্কৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে; রস-উপলব্ধিতেও—"বিজ্ঞানসম্মত অনুধাবনে কবিতা অধিকতর উপভোগ্য হয়ে ওঠে" (জর্জ টমসন)। (ঙ) "যেদিন বীণা নিজে-নিজে বাজবে, মাকু নিজে-নিজে চলবে, সেইদিনই দাসত্ব থেকে মুক্তি মানুষের" আরিসততল-কল্পিত এই মুক্তির সুযোগ এনে দিয়েছে প্রযুক্তি—অধিকতর অবসর, অবকাশের আনন্দ, সৃষ্টি-সুখের উল্লাস। (চ) শিল্প-সাহিত্যকে সৃষ্টিলীলাকে জন্ম-গতি-বৈচিত্র্য দিয়েছে প্রযুক্তি, স্বাদ-ব্যাপারকেও। আজ ইলেকট্রনিক্‌স্‌বাহন নতুনতর যন্ত্র আর মাধ্যম—রেডিও ফিল্ম টিভি ভিসিআর—তন্নির্ভর শিল্প, তজ্জাত নতুন স্বাদ-অভিজ্ঞতা, রস-উপভোগের নবদিগন্তে হৃদয়ের পাখামেলা। (ছ) বিজ্ঞান মনকে নিয়ে যায় সব সংকীর্ণতামুক্ত এক বৃহত্তর মিলনক্ষেত্রে, সম্প্রদায়-বোধের ঊর্ধ্বে গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-জাতীয়তার চেতনায়, এবং আন্তর্জাতিক বোধিতে; সর্বজনীনতা তার চরিত্রের মেরুদণ্ড। তার জোরে যন্ত্রবিজ্ঞানী মানুষ কদিন ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হবে, সব রহস্য ভেদ করবে, নিজের জীবনকে গড়ে তুলবে নিজের মনের মতো, পৃথিবীকে করে তুলবে 'একটি বিশ্বৈকগ্রাম', অদ্বিতীয় একনীড়-স্বর্গ।

নেতিবাদীদের বক্তব্য: (ক) বিজ্ঞানের লক্ষ্য যা-ই হোক, জন্তর-মন্তরের 'নয়া পাদরি'দের অনুগ্রহে পৃথিবী ইতিমধ্যেই নরক হয়ে উঠেছে: পরিবেশ বিপর্যস্ত, প্রকৃতি রিক্ত-বিযাক্ত, সমাজ ক্ষতবিক্ষত, ব্যক্তি 'ফাঁপা মানুষ'। (খ) নতুন-নতুন যন্ত্র মানেই নয়া-নয়া সমস্যা। আবিষ্কারপট্‌ যন্ত্রবিজ্ঞানের মেহের-বানিতে আজ পৃথিবী জুড়ে অসাম্য রেষারেষি জাতি-বৈর, যুদ্ধের আতঙ্ক, মৃত্যুর বিভীষিকা। মহাকাশ-গবেষণার অর্থ: শোষণ-সমৃদ্ধি; ভেষজগবেষণার ফল: নতুনতর জটিলতর ব্যাধি; আন্তর্জাতিকতার পরিণাম: নয়া উপনিবেশবাদ, সুপার-পাওয়ার ভজনা, মালটিন্যাশন্যালের ফাঁস। (গ) ইনডাসট্রির প্রয়োজনে মাস প্রোডাকশন, কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি, জবরদস্তি মাস-কনজামশন; অপ্রয়োজনীয় বস্তুর স্তূপ, তার তলায় পিষ্ট ক্লিষ্ট মানুষ, মনুষ্যত্ব। যত শিল্পোন্নতি,

তত ছড়িয়ে যাচ্ছে দূষণ ; যত অ্যানটিবায়োটিক্স্-পেসটিসাইড্স্, ততোই মানুষপশুউদ্ভিদের স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট, মগজকে যেমন অকেজো করে দিচ্ছে ক্যাল-কুলেটর-কমপ্যুটর-ইডিয়ট বক্স্। উগ্র শুধু একটিই প্রবৃত্তি : অর্থগৃধ্নুতা। (ঘ) অ্যাসেম্বলি লাইনে উৎপাদন, তার সঙ্গে টেকনিশিয়ানের আত্মিক যোগ ঘটে না। স্পেশালাইজেশনের এবং স্ট্যানডার্ডাই-জেশনের নামে জ্ঞান সীমিত, স্টাইল পলাতক—একই প্যাটারনের বাড়িগাড়ি-পোশাক উপন্যাসনাটক-চল-চ্চিত্র, 'মাস-কালচার' অর্থাৎ গণসংস্কৃতিপিণ্ড। (ঙ) ঘরে-ঘরে গ্যাজেট, গৃহবাসী তাদের চেনে না ; যেহেতু যন্ত্রের প্রাণ নেই, অনুভূতি নেই, জন্ম-মৃত্যু নেই, পার্টস জুড়ে-জুড়ে তার অবয়ব-সংস্থান, বেকার হলেই ওজনদর জাংক্ বা জাদুঘরে। প্রকৃতির মতো কোনো তত্ত্ব সে শেখায় না, ইন্‌টেলেক্‌টকে শানিত করে না, উজ্জীবিত করে না কোন জীবনদর্শনে বা সৃষ্টিলীলায়। তার কাছে সবই জড়, সবই প্রয়োজন, সবই কমো-ডিটি—আর্টও। এবং সে আর্ট—যার চূড়ান্ত 'কলা-কৈবল্যবাদ'—"উৎকেন্দ্রিক···চিৎকৃত প্রগল্‌ভতা"। (চ) যন্ত্রবিজ্ঞানের কাছে পৃথিবী একটি সুপারমারকেট, সমাজ এক অতিকায় মেশিন, শহর সাব-মেশিন, যন্ত্র স্বয়ং মানবিক, মানুষ যন্ত্রাংশ—স্ক্রু ঢিলে হতেই শেকড়-ছেঁড়া শেকড়হীন উদ্বাস্তু ; লক্ষ্যহীন জীবনে শূন্যতা-অস্থিরতা-বিচ্ছিন্নতার শিকার ; বাধ্য হয়ে সমাজ-বিরোধী—ড্রাগ ডিস্‌কো সেক্‌স্ ক্রাইম ক্রাইমথ্রিলার হিপি গডম্যান, কিছুই না পারলে আত্মহত্যা। আর্থার কোয়েলারের ভাষায় "আর্‌বন বারবারিজম" শহুরে বর্বরতার চূড়ান্ত। (ছ) অন্ধ বধির খঞ্জ যন্ত্রদেবতা 'দ্য গড দ্যাট লিমপ্‌স্' মানবতাবিরোধী তাই নীতি-ভ্রষ্ট দুর্বৃত্ত তাই 'ইম্‌র‍্যাল'। তার বিরুদ্ধে লড়াই মানবনীতির লড়াই, যুগ-যুগ ধরে চলছে বুদ্ধ কনফু-শিয়াস সোলোজ থেকে গান্ধী পর্যন্ত।

দ্বি-ধার প্যারাডক্স্ : শৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলা, নিয়ম আর অনিয়ম, অগ্রস্মৃতি আর পশ্চাদপসরণ, যুক্তিসম্মিতি আর অযৌক্তিকতা, আর্থিক সমৃদ্ধি আর আত্মিক অবক্ষয়। এই দ্বন্দ্বের শেষ কোথায়? সমাধান কী? কিভাবে? তা নিয়েও ভাবছেন সমাজবিজ্ঞানী সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা, পথ খুঁজছেন, সূত্র সংগ্রহ করছেন, সঞ্চয় করছেন সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার আগে চার্লস স্নোর যে-মূল অভিযোগ কলা আর বিজ্ঞানের "জন্মগত বিরোধ" প্রসঙ্গে, তার উত্তরটা দেখে নেওয়া দরকার।

### ৪. কলা ও বিজ্ঞান

পল ভ্যালেরি যখন লেখেন, "দ্য মেকিং অব এ পোয়েম ইজ ইটসেল্‌ফ্ এ পোয়েম" তখন তিনি সৃষ্টি-লীলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের কথাই বলেন, যা সচেতনভাবে করত ন্যাচরালিসট-ইমপ্রেশনিসটরা। তাই একদা রয়্যল সোসাইটি উৎসাহ দিয়েছিল 'সায়েনটিফিক কাপলেট' রচনায় ; নিউটনের 'অপ্‌-টিক্স্' কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছিল ; আমেরিকান-ইনডিয়ান মীথের ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিল ট্রসের একটি সংগীত রচনার উৎস। যন্ত্র আর শিল্পের জোড় মিলিয়েছেন আর্নসিট, ডান, মায়াকোভস্কি, ক্লী, হেপ-ওয়র্থ, আর্প্ প্রভৃতি কবি-চিত্রকর-ভাস্কর। ব্যালেতে নবরীতি এনেছেন মার্থা গ্রাহাম প্রমুখ কোরিও-গ্র্যাফাররা। এই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে ইলেকট্রনিক্স্-এর আবিষ্কারে, কম্যুনিকেশন্‌স্ টেকনোলজির দ্রুত উন্নতিতে। মানুষের 'দ্বিতীয় জগৎ' ক্রমেই অসীম হয়ে উঠছে মাকে পরিত্যাগ না করে। দ্বিতীয়ত (দর্শন) বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য প্রত্যেকটিই জীবনকে দেখার বোঝার বোঝানোর বিভিন্ন উপায়। ফলত, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এবং কলা উভয়েরই কাজ : বিশৃঙ্খলকে সংগঠিত করা, একটি বিষয়ের বিবিধ উপাদানগুলিকে ঐক্য দান করে আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচরে আনা, বাস্তবকে সম্পূর্ণরূপে ধরে দেওয়া আমাদের জ্ঞানে আর অনুভবে। উভয়ের পারস্পরিকতা তাই স্বত এবং ট্রাডিশনাল আর্ট এবং ইলেকট্রনিক্স্







শিল্প পরস্পর-আত্মীয়। আদিম মীথ থেকে যেমন আধুনিক মাইথোপিয়া, তেমনি আদিম কৃত্য থেকে যাত্রা মাইম মঞ্চনাটক বেতারনাটক চিত্রনাট্য টেলি-নাট্য অসংখ্য সরল আর বক্র রেখা দ্বারা নিয়ত সংশ্লিষ্ট।

আমাদের যেমন 'শিল্প' আর্ট আর ইনডাসট্রি দুইই বোঝাতে, গ্রীক 'টেখ্‌নে' শব্দেরও অর্থ একই সঙ্গে চারু এবং কারু। ব্যবহারিক প্রয়োজনে কারু, তার দেহে চারুতা জাদুর প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে, "ক্রাফ্‌ট্-এর বাই-প্রোডাক্‌ট্ আর্ট" (গোটেফ্রিড সিমনার)। অর্থাৎ আর্টের আত্মপ্রকাশ ক্রাফ্‌ট্-এর বেদিতে, প্রযুক্তির টেকনোলজিই তার টেকনিকের নিয়ন্তা ; সমতল দেয়াল এবং উত্তল ভাসের ওপর একই ডিজাইন তবু এক নয়। আর্ট যখন আর জাদু বা বাই-প্রোডাক্‌টও নয়, কেবলি প্রয়োজনাতীত, তখনও তার আত্মপ্রকাশের জন্যে চাই একটি মাধ্যম : কণ্ঠ বা দেহ বা বাদ্য বা কাগজ বা ক্যানভ্যাস ; চাই 'টুল্‌স্' বা হাতিয়ার : ভোক্যাল কর্ড, কালিকলম-তুলি হাতুড়িবাটালিছেনি আঙুল বা ছড়। এই মাধ্যম আর হাতিয়ার এবং তাদের টেকনোলজি তথা প্রযুক্তির টেকনিক, তিনে মিলে শিল্পকে দেয় তার আঙ্গিক আর উপকরণাদি, একটি বিশিষ্টরূপ যা তার নিজস্ব। বিষয় তখনই চরিত্রবান হয়ে ওঠে বিশেষ ভঙ্গিতে। মাটি পাথর বাঁশ কাঠ টিন ইট কংক্রিট প্রিফ্যাব প্রেস্‌টিস্—প্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন স্থাপত্য। বস্তু, তা থেকে এক বিশেষ প্রযুক্তি-কৌশলে গ'ড়ে-ওঠা এক-একটি মাধ্যম, তদনুযায়ী হাতিয়ার-উপকরণ-প্রকরণ-আঙ্গিক, রূপ নেয় শিল্প। শিল্পীকে তাই, টেকনিশিয়ান নয়, হতে হয় টেকনো-লজিসটও ; বাজনাকে চিনবেন বাদ্যকর, শব্দকে কবি, ক্যামেরাকে আলোকচিত্রী, বাদ্যযন্ত্র-কারিগরের যেমন চাই সুরজ্ঞান। শিল্পের সম্পূর্ণ নাম তাই 'শিল্প-মাধ্যম' ; এই মাধ্যমই একটি শিল্প থেকে আরেক-টিকে পৃথক করে ; এবং প্রতিটি মাধ্যমের আছে সীমাবদ্ধতা, তার বাইরে সে যেতে পারে না—সেখানে তার দুর্বলতা, সেখানেই তার জোর, তার আপন স্বতন্ত্রতা। কণ্ঠে গানই বাজে, দেহে নাচই ওঠে, ছবি দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক মূর্তি ; হেডফোন রেডিও টিভি ; রেকর্ডপ্লেয়ার টেপরেকর্ডার ক্যাসেটরেকর্ডার ; কিংবা, ইলেকট্রনিক সিন্‌থেসাইজার বা স্ট্রোবো-স্কোপিক ক্যামেরা, যে যার নিজের এলাকায় সম্রাট।

প্রযুক্তির ফর্ম থেকেই জন্ম নেয় সৃজনী তথা শিল্পের ফর্ম—খোদাই ছবি, খুশনবীশি, লিথোগ্র্যাফি, অফসেট, ফটোকমপোজিশন অথবা খোদাই ছবি, আঁকা ছবি, স্কেচ, তেলরঙ, ফটোগ্রাফি। অর্থাৎ নতুন-নতুন প্রযুক্তি নবনব আর্টের জন্ম দেয়। যথা, চলচ্চিত্র : "দ্য মেশিন ইজ ইট্‌স্ অরিজিন, ইট্‌স্ মিডিয়াম অ্যাণ্ড ইট্‌স্ স্যুটেব্‌ল্ সাবজেক্‌ট্" (হাউসার)—কেবলই চলা ; বিষয়-ক্যামেরা-ফিল্ম চলে, চলতে-চলতেই একক ফ্রেমগুলি দৃশ্যের ইলি-উশন হয়ে ওঠে, চলমান স্থিরচিত্র মিলেমিলে চলৎচিত্র। সৃষ্টিকৌশলও অভিনব—কালানুক্রমিক কাহিনীর শুটিং হয় স্থানানুক্রমিক, আগে-পরের ঘটনাগুলিকে লোকেশন-স্টুডিও মোতাবিক গ্রুপিং করে নিয়ে ; সম্পাদকের টেবিলে কাটছাঁট করে তাদের আবার সাজিয়ে নেওয়া হয় মূল পরিকল্পনা-মতো সময়-সারণিতে। তার পরে শব্দাদি ট্রিক যতি-চিহ্ন যোজনা। তারও পরে সেনসরের কাঁচি। হয়তো কিছু রিশুটিংও। স্থান-কালের বিপর্যয় তাই চলচ্চিত্রে স্বত, রেডিওতে আরও বেশি। তার চেয়েও বড়ো কথা : এই যে একটি ধারাবাহিক গল্পকে উলটে-পালটে তৈরি করে নিয়ে আবার তাকে উলটেপালটে সোজা বা মনের মতো সাজিয়ে নিয়ে হাজির করা—শিল্পসৃষ্টির এ এক নবতম প্রক্রিয়া। আস্বাদনেও অভিনবত্ব—চিত্রগৃহে স্ব-সীটে বসে-বসেই ছবির সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকও চলতে থাকে কাছে দূরে হেথা হোথা! আর স্বগৃহে, স্বাদ-ব্যাপারটিও ভোক্তার

করতলগত—যখনখুশি অ্যাপারেটাস খুললাম, যখন-খুশি বন্ধ করলাম, রিপ্লে বা রিওয়াইনিডিং বা ভল্যুম কি ইমেজ কনট্রোল, চলন্ত ছবিকে দাঁড়ই করিয়ে দিলাম বা, অথবা নব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ব্যানড-চ্যানেল বদলে-বদলে চলে গেলাম যথা-ইচ্ছা মনপসন্দ প্রোগ্রামের সন্ধানে। টেলিফোনে ক্রস-কানেকশনের মতো দুটো স্টেশন যখন ক্রস করে, ঝংকৃত হয়ে ওঠে শব্দের মনতাজ, ছায়াচিত্রের কোলাজ। যন্ত্রমুগ্ধ রসিকের কাছে এটি একটি বিরাট উপরি-পাওনা। এবং এসবই সম্ভব হয় যন্ত্রবিজ্ঞান তথা টেকনোলজির দৌলতে। শিল্প তার বিনীত অনুগামী।

পঞ্চমত, কথা শোনা আর বই পড়া, মুখোমুখি আলাপ আর টেলিফোন-সংলাপ অভিন্ন অভিজ্ঞতা নয়; তেমনি প্রথাগত শিল্পমাধ্যমের এবং ইলেক-ট্রনিক্স্ শিল্পমাধ্যমের আবেদনও পৃথক-পৃথক। 'রেডিও শোনার কান', 'ছবি দেখার চোখ' তৈরি করতে হয়; সিনেমাহলে চলচ্চিত্র এবং ড্রয়িংরুমে টেলিচিত্র দর্শন বিভিন্ন মানসিক প্রস্তুতির অপেক্ষা রাখে। প্রতি ক্ষেত্রে রস-উপভোগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন-ভিন্ন। উপনীতির পথটা কিন্তু অভিন্ন—কান যা শোনে না শুনতে পায় না, চোখ যা দেখে না দেখতে পায় না, তাকে শোনায়-দেখায় যন্ত্র; যে-ব্যক্তি মৃত বা যে-বাস্তব হাজার মাইল দূরে, তাদের হাজির করে জীবন্তরূপে, যথাবৎ সামনেই, কখনো-বা একাধিককে একসাথে জড়িয়ে মিশিয়ে। পরিণাম আমাদের দর্শন ও শ্রুতিশক্তির অকল্পনীয় সম্প্রসারণ—রোমানটিকতা-মাধ্যমে নয়—যন্ত্রসহায় মায়ের বাস্তব-সম্মিতিতে। প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের সম্ভব-অসম্ভবের ইলিউশন-রিয়েলিটির এক আশ্চর্য দ্বৈতাদ্বৈত লীলা: "এক্স্টেনশন্ অব ম্যান"।

অনস্বীকার্য: বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্পের মধ্যে সর্বত্র সামঞ্জস্য থাকে নি, যন্ত্রবিজ্ঞানের মহিমামণ্ডিত গণ-মাধ্যমগুলি হয়ে উঠেছে অপপ্রচারের মাধ্যম, সাংস্কৃতিক শোষণের হাতিয়ার যাকে রাসকিন বলেছেন 'অপসংস্কৃত ইনডাসট্রিয়াল আর্ট', যা জন্ম দেয় ম্যাকলুহান-নিন্দিত "বুদ্ধিরুচি খুইয়েবসা মুগ্ধবোধ শ্রোতা", মামফোর্ড-কথিত "ঈস্থেটিক ইডিয়ট"। তবু শিল্পও তো সৃষ্টি করে এই যন্ত্রই। শত বহিরঙ্গ বিরোধ সত্ত্বেও গভীর ভিত্তিমূলে বিজ্ঞান আর কলা যে ঘনিষ্ঠতম পরমাত্মীয়, এই সরল সত্যটি কলাবিদ-বিজ্ঞানবিদ স্নো সাহেব কেন-যে ধরতে পারেন নি! অথচ, এই আত্মীয়তার সূত্র ধরেই দুই সংস্কৃতির বেড়া ডিঙিয়ে পৌঁছনো যায় সেই সমুদ্র-সরোবরে যেখানে শতদল মেলে দেয় তৃতীয় সংস্কৃতি।

## ৫. তৃতীয় সংস্কৃতি

"বিজ্ঞানের অনুগতা কন্যা প্রযুক্তিবিদ্যা" ইতি ম্যাক্স্ সালভাদোরি। এটা আধুনিক সংজ্ঞা। আদিম প্রযুক্তি ছিল অভিজ্ঞতানির্ভর, হাতেকলমে শিক্ষা, কাজ করতে-করতেই ওস্তাদ, যেমন-যেমন প্রয়োজন তেমনি-তেমনি আবিষ্কার, হঠাৎ-হঠাৎই। ব্যবহারিক কলাকৌশল, তার সঙ্গে জাদু-মীথ-কৃত্য। ধ্রুপদী যুগ থেকে ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের আপন চারিত্র্য: তথ্য পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত তত্ত্ব প্রয়োগকলা। তার মদতে মানুষ জলে-স্থলে সম্পদের অধীশ্বর, প্রাকৃতিক নিয়মের প্রবক্তা, দক্ষ সংগঠকও; তাই দিয়ে সে গড়ে তোলে নিজ জীবন, সমাজ, সংস্থান, তাদের উপাদান-উপকরণাদি (হিউম্যান ইউজেজ) এবং সবার ওপর তার নিজস্ব জগৎ, ধর্মদর্শনসাহিত্যশিল্পসংস্কৃতি (হিউম্যান ভ্যালুজ)। 'প্রাকৃতিক পরিবেশ' তার মধ্যে 'মানবিক পরিবেশ'। বিশ্ববিধান অব্যাহত থাকে উভয়ের ভার-সম অবস্থানে যেখানে তৃতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি।

এই ভারসাম্য বিনষ্ট বিব্রত হয়েছে—বাহির এবং আন্তর উভয় প্রকৃতির রাজ্যেই—আজ নয়, হাজার হাজার বছর ধরে প্রযুক্তির অ-/অতি-/অপ-ব্যবহারে। তার জন্যে দায়ী বিজ্ঞান বা যন্ত্র নয়, মানুষই। সে-ই







তো মূল আবিষ্কর্তা আর প্রয়োগকর্তা; কমপ্যুটর রোবটকে সে-ই তৈরি করে, ফীড করে, চালু করে, চালায়। আজ যদি তারা ফ্রাংকেস্টাইন, সে মানুষেরই দোষে, তার অজ্ঞতায় অতিলোভে অতিদম্ভে এবং অবশ্যই অমানবিকতায়। এই সত্য জানাচ্ছে শিল্প আর দর্শন, এই তথ্য সংকলন করেছে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি। নষ্টকোষ্ঠীর উদ্ধার যদি করতে হয়, উভয়ের অবিনা সহযোগেই। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সাহিত্যের সপক্ষে অবহেলা করেছি বিজ্ঞানকে-প্রযুক্তিকে। আজ ঘটছে তার বিপরীতটা—বিজ্ঞান সুপারম্যান, প্রযুক্তি সদাপ্রভু, যন্ত্র জাদুর উৎস: অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 'আনহোলি ট্রিনিটি'। সিস্ফকার রাজ্যে যেমন 'আর্ট্স্ ফর আর্ট্স্ সেক', নিরীক্ষার রাজ্যে তেমনি 'সায়েন্স ফর এক্স্পেরি-মেন্ট্স্ সেক', আবিষ্কারের নেশায় আবিষ্কার। যুগযুগসঞ্চিত এই অসমান হ্রাসবৃদ্ধির ফলে আমাদের জীবন হয়ে গেছে বহুবিস্রস্ত, আত্মার হাজার কুঠরি, আত্মশক্তি হীনবল। এখন অত্যন্ত জরুরি তাদের একঠাঁই করা, ফিরিয়ে আনা স্বভাবে আর সাম্যে। সে-কাজ মানুষকেই করতে হবে। তার আছে "অন্ত-হীন সৃষ্টিক্ষমতা" (মাও সেতুং)। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে: সদিচ্ছা, দায়িত্বজ্ঞান, মানবতাবোধ—যে-মানবতাবোধে ফ্যারাডে বিষাক্ত গ্যাস বানাতে অস্বীকার করেন, নীল্স্ বোর আণবিক কার্যক্রমের ওপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করেন, আইনস্টাইন অনুতাপ করেন পারমাণবিক বোমার ধ্বংসমুখ খুলে দিয়েছেন ব'লে।

কাজটা সহজ হবে না। লোভ এক দুরারোগ্য দুষ্প্রবৃত্তি, ট্রাডিশন দুর্মর সংস্কার, শক্তি এক মায়াবী মোহ এবং বিবিধ স্বার্থপরতার চক্রব্যূহে সমাজ আজ জটিল। সব ভেঙে ফেলে জীবনকে নতুন করে গড়তে হবে, রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি এবং শিক্ষা-নীতিরও সমূহ পালাবদলের মধ্যে দিয়ে—দর্শনশিল্প-বিজ্ঞানপ্রযুক্তি মিলিয়ে এক সুসম সর্বার্থসাধক পাঠ-সূচী এবং কর্মসূচী ন্যায়-মূল্যবোধ-মানবপ্রেমে আপ্লুত। মানুষকে পুনশ্চ অর্জন করতে হবে মনুষ্যত্ব। প্রযুক্তিকে, যন্ত্রকে স্থাপন করতে হবে তার স্বস্থানে, করে তুলতে হবে, ক্রোপোটকিন যেমন বলেছেন, 'অ্যান এজেনট অব লাইফ'—মানুষের আজ্ঞাবহ, 'কালচার্ড আর্টি-স্টিক'। তার জন্যে সুস্থ এবং সমৃদ্ধ করতে হবে আমাদের মননশক্তিকে, মেলাতে হবে বৈজ্ঞানিকতা আর মানবমুখিনতা, বিজ্ঞানদৃষ্টি আর শিল্পদৃষ্টিকে—অনুসন্ধিৎসা আর কল্পনা, যুক্তি আর আবেগ, বিশ্লেষণ আর সমীকরণ, সৃজন আর প্রয়োগশীলতা। ফিরে আসবে মানুষের আত্মবিশ্বাস, আপন সৃষ্টিশক্তিতে শ্রদ্ধা, জীবনে আস্থা। মানুষ হবে শিল্পী এবং শিল্প-পতি, একই সঙ্গে 'টুলমেকার' এবং 'সিমবলমেকার': তৃতীয় সংস্কৃতিমান।

এক কথায়, শিল্পবিজ্ঞানের এক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে—যাবতীয় নেতির বিরুদ্ধে, ইতির সপক্ষে, ভেদহীন সমানতা এবং সামঞ্জস্যের দাবিতে, যাবতীয় ভয়- আশাহীনতা- বিচ্ছিন্নতা- হননেচ্ছা- নৈরাজ্য-নৈরাত্ম্য থেকে মুক্তিলাভের অনমনীয় আকাঙ্ক্ষায়। তারই জয়বেদিতে রূপ গ্রহণ করবে তৃতীয় সংস্কৃতিমান মানুষ: "ইকোয়াল আনক্লাস্ড্ ট্রাইবলেস নেশনলেস ...দ্য কিংগ্ ওভার হিমসেল্ফ্" (শেলি); সার্থক হবে ইউনেসকোর আজীবনের বাসনা: "মেনি ভয়েসেজ ওয়ন ওয়র্লড"॥

সংযোজন:

> "কি ছিল, কী হইয়াছে! যেদিন হইতে সমাজের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরা শিল্পবিজ্ঞানের চর্চা ত্যাগ করিয়া তাহার ভার অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেদের উপর অর্পণ করিলেন, সেইদিন হইতে আমাদের কপাল পুড়িল!" (প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১৩২২ ভাদ্র প্রবাসী)

সিন্ধুসভ্যতাবাসীদের মতো বৈদিক যুগের ঋষিদেরও প্রকৃতি এবং বস্তুজগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল। সূত্রযুগে অবনতি, বৌদ্ধ-জৈন বিশেষত মগধ রাজত্ব-কালে পুনরুজ্জীবন, এইভাবে নানা উত্থান-পতনের

মধ্যে দিয়ে ভারতীয় মনীষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিদ্যা—গণিত জ্যোতিষ চিকিৎসা স্থাপত্য ভাস্কর্য সেচ ধাতু বয়ন ভেষজ রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি—ক্রমসৃত হয়েছে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। শূন্য ভারত-এর আবিষ্কার, শূন্য ব্রহ্ম, বৌদ্ধ শূন্যতাবাদও। তন্ত্রের চক্র-যন্ত্র-সংগম, যোগের আসন-প্রাণায়াম-সংযম, হঠযোগের রসায়নতত্ত্বেও সেদিন ধর্ম, শিল্প ও ফলিত বিজ্ঞানের লক্ষণীয় মেলামেশা ছিল। শবব্যচ্ছেদ তো বটেই, কাটা নাকও তখন জোড়া লাগত। রাজস্থানের পাগড়িতে যে-রঙ ধরানো হত, আলোর হেরফেরে তার বিভিন্ন রঙ ঝলসে উঠত। অজন্তার গুহাচিত্রে আলো-ছায়ার এই রঙফেরা দেখেছিলেন লেনয়, সঙ্গে ছিলেন পদার্থবিদ সি. ভি. রমন। ভারতীয় তালে শব্দ-বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন আনে দ্য ন্যূ, ভারতীয় সংগীতে গণিতকে যেমন পেয়েছিলেন ম্যাক্স্‌মূলর। উচ্চকোটি শিল্প-সাহিত্যের সমান্তরাল ভাববাদী দর্শন এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব, এমনকি এক প্রবল বস্তুবাদী দর্শনও। নীডহামের মতে, ১৪শ-১৫শ শতক পর্যন্ত য়োরোপের সমপাঠী ছিল এশিয়ার বিজ্ঞান। ক্ষয় কিন্তু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল পৌরাণিক ভারতবর্ষে যখন দক্ষতাজনিত বৃত্তিভেদ কর্মফলসঞ্জাত বর্ণভেদে শেষে জন্মগত জাতিভেদে পর্যবসিত। শিল্পসাহিত্যদর্শন ধর্মের মুখাপেক্ষী, শাস্ত্র-অনুগত, ভক্তিরসসিঞ্চিত। আচার্যের উদ্ধৃত বিলাপ তারই স্মরণিকা। ১৯শ শতকে, প্রতিকূল ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে, নতুন করে বিজ্ঞানের অনুশীলন, কেল্লায় তোপ দেগে পোস্টমর্টেমে হাতেখড়ি, কালক্রমে সাহিত্যে-বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজও। তত্রাচ, বিদ্যায়তনে বিজ্ঞানপাঠ শ্রেণীহীন কারিগর ও কলমজীবী কেরানিকুল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, জীবনে-মানসে প্রয়োগের জন্যে নয়। তাই আধুনিক কোনো জীবন-দর্শনও এখানে একালে উদ্ভূত হল না। এগিয়ে গেল শুধু শিল্প আর সাহিত্য। অনিবার্য স্ববিরোধ আর বৈপরীত্য : বস্তুভাবনা আর কল্পভাবনা, বিজ্ঞানবুদ্ধি আর ভাবালুতা, জীবনচেতনা আর বায়বীয় তত্ত্ব এপিঠে-ওপিঠে, পাশাপাশি, প্রায়শই জড়িয়ে-মিলিয়ে।

ইনডাসট্রিয়ালিজেশন শুরু হল স্বাধীনতার পর, ডালপালা মেলতে আরম্ভ করল, ইদানীং মালটি-ন্যাশন্যল যৌথ উদ্যোগও। প্রায় পাঁচশো বছরের অগ্রজ য়োরোপকে ধরে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টায় কোমর বেঁধে শিল্পোদ্যোগ, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। সমাজকে নূতন-ভাবে বিন্যস্ত বা জনগণকে শিক্ষিত প্রস্তুত করে তোলা হল না। একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজের ওপর আ রোপিত হতে লাগল একের পর এক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান নয়, যন্ত্র। (অগ্রজের সঙ্গে জেনারেশন গ্যাপ থেকেই গেল,) : এলোমেলো অসম বিকাশ ; ললাট-লিখন : অনুসরণ-অনুকরণ-অনুদানগ্রহণ ; ইনডাস-ট্রিয়াল আর্টও : একের পর এক শিল্প আমোদ ও বাণিজ্যের উপকরণ। ট্রাডিশনাল শিল্প তার অনুগামী। এরই মধ্যে উচ্চবিত্ত আর্ট সৃষ্টি যেটুকু ক্ষীণতোয়া, মুষ্টিমেয়ে সীমাবদ্ধ, প্রায়শ বিচ্ছিন্ন। কোথাও নেই সুষ্ঠু মিলমিশ, কোনো মৌলিক তত্ত্ব। সবচেয়ে বড়ো অভাবটা এইখানে—দার্শনিক অনেক এলেন গেলেন আছেন, প্রস্তুত হল না একটাও বস্তুবাদী দর্শন যা দিয়ে চিনতে পারব এই জগৎকে-জীবনকে। ইতিহাস লেখা হল না সঠিকভাবে, যার স্বচ্ছ দর্পণে আত্মদর্শন করব। এখানে 'গান্ধী' তোলেন অ্যাটেনবরো, ওখানে পিটার ব্রুক নামান 'মহাভারত', স্কট লেখেন 'রাজ কোয়ার্টেট'; আমরা কষে সমালোচনা করি। খুবই স্বাভাবিক : আমাদের নাচগানবাজনা হয় অ্যানাটিক অথবা অনুকরণ, চিত্রকলাস্থাপত্যভাস্কর্য হয় অনুকরণ অথবা দুর্বোধ্য ; সর্বোপরি, বোমবাই ছবি, টিভি সিরিয়্যাল, পরনোগ্রহরাজি। অর্ধপক্ক মাস-কালচারের স্টীমরোলার, তার চক্র-চাপে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের সংস্কৃতিচেতনা নিপাট সমতল।

ইনডাসট্রির অতি-বৃদ্ধি জনস্বার্থ-বিরোধী এবং সমাজ-ভাঙানিয়া—ঈভান ইলিচের এই সিদ্ধান্ত আমাদের জন্যে নয়। বিগত শতকের মাটি-আঁকড়ে-থাকা আগামী শতকের প্রতীক্ষা-শবরী আমাদের সবই ভাঙা, জোড়াতালি দেওয়া, স্মৃতি সামনে-পেছনে দুদিকেই : 'আলট্রা মডার্ন সুপার-প্রিমিটিভ'। বিজ্ঞান-আলোচনা, আত্মসমালোচনায় সমান অ্যালারজি, আমাদের সৃষ্টির পরিধিসীমিত, গতি নিয়ন্ত্রিত, জীবনভাবনা অনুত্তেজিত। না একটা মৌলিক নাটক, না ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র, না মহাকাব্যোপম উপন্যাস, যার মধ্যে স্তনিত বৃহত্তর জীবনের সমুদ্রগর্জন, গোটা দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত, যার অভিভবে সমগ্র সত্তা উদ্দীপ্ত এক মহত্তর যৌথ ভাবকল্পে। রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও 'গুরুদেব' হয়ে গেলেন! "ভারত তার অতীতকে হারিয়েছে, নতুন দুনিয়াকেও পায় নি"—মার্কসের এই মন্তব্য সত্য, ১৮শ-১৯শ নয়, বিংশ শতকের এই শেষ অনুচ্ছেদে।

আনুমানিক সাল ১৯৬৮ থেকে—একটি আণবিক বিস্ফোরণ, একাধিক রকেট উৎক্ষেপণ, পুনঃপুন দক্ষিণ মেরু অভিযান ইত্যাদি সহ—নতুন ভারতের বিজ্ঞান অনুশীলন ক্রমেই দেশব্যাপী, সেইসঙ্গে বিবিধ গ্রন্থ প্রবন্ধ পত্রিকাও। অধিকাংশই প্রয়োজনের ভূমিতে 'ল্যব্‌ টু ফ্যাক্‌ট্রি টু ল্যণ্ড্‌'। নিত্যনতুন গ্যাজেটের কল্যাণে বস্তুকে আমরা খুব চিনছি কিন্তু বাস্তবতার শেকড় নামল না আমাদের মনে আর মননে। আজ সাধারণ মানুষও প্রযুক্তি-সচেতন অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি চারিয়ে গেল না এমনকি অসাধারণ মানসেও। বুদ্ধি-জীবিতাও এখানে জটপাকানো ; 'দুই সংস্কৃতি' না, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আর শিবিরের অধিবাসী সব। এই ট্র্যাজিক বিচ্ছিত্তির চমৎকার দৃষ্টান্ত যোজনা কমিশন প্রকাশিত 'যোজনা' পত্রিকার দুটি সংখ্যা। প্রথমটি ১৫ অগসট ১৯৮৩ "সায়েনটিফিক টেমপার অ্যার বনডেজ অব ট্র্যাডিশন—মাত্র দুটি প্রবন্ধ বাদে বাকি সব কথার কচকচি, ঐতিহ্যের রূপ-বিরূপ ও বৈজ্ঞানিক মেজাজের তুল্যমূল্য বিচার-রহিত। দ্বিতীয়টি ১৫ অগসট ১৯৮৫ "হোয়াই লিভ উইথ নন্‌সেন্‌স্‌"—গোঁড়ামি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ঘাতক উদ্ভপ্ত নিবন্ধাবলী। লেখকগোষ্ঠী ভারতখ্যাত বাঘাবাঘা চিন্তাবিদ। কিন্তু হায়, একজনও বুঝিয়ে বললেন না বা বলতে পারলেন না : কেন ধর্ম 'নন্‌সেন্‌স্‌'! না তার তথ্য, না তত্ত্ব, না ঐতিহাসিক বিচার। নতুন কোনো দার্শনিকতা তো নয়ই। শুধু উচ্ছ্বাস আর উপদেশ আর হুমকি! যেন, চার্লস স্নোর মূল অভিযোগেরই প্রত্যক্ষ উদাহরণমালা! যে-কোনো বিষয়ই হোক, তাকে যদি হাজির না করা হয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে, বক্তব্য কোনো আকার নেয় না, চরিত্র পায় না, সত্য হয়ে ওঠে না, এবং কেউ কর্ণ-পাতও করে না। হলও তাই—ইতিউতি কতিপয় ক্রুদ্ধ আবেগফোলানো ঢেউ, ফুরিয়ে গেল, সামান্যতম দাগও পড়ল না সমাজের দেহে বা মানসে। স্বয়ং বুদ্ধিজীবী-দেরই যখন এই হাল, তখন সাধারণ মানুষের কাছে আর কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে! এবং শিল্পা-সাহিত্যিকদের কাছেও!

তথাপি প্রচেষ্টাটি নিঃসন্দেহে সাধু এবং বলিষ্ঠ। এই সাধুতা এবং বলিষ্ঠতা যেদিন অভিব্যক্ত হবে বাস্তবসচেতন নব্য ভারতীয় দর্শন-তত্ত্বরূপে, বিজ্ঞান-চেতনায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে আমাদের সমগ্র জীবন আর মন, সেইদিনই আমাদের সাহিত্যে-শিল্পেও আসবে পূর্ণতা। এবং একমাত্র তখনই আমরা পৌঁছতে পারব সেইখানে যেখানে : ত্রয়ীর অদ্বয় মিলন-প্রসূত প্রস্ফুটিত অপরূপসী তৃতীয় সংস্কৃতি॥

# রেনেশাঁস-মানুষ রাজশেখর বসু

**রাজশেখর বসু : জীবন ও সাহিত্য**—কল্যাণী ঘোষ। ফার্মা কে. এল. এম, কলিকাতা। পঞ্চাশ টাকা।

ইয়োরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে যে রেনেশাঁস-মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় আমাদের দেশে তার এক সার্থক প্রতিরূপ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দুর্ভাগ্যক্রমে রামেন্দ্রসুন্দর দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নি। ফলত এই অনন্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা সম্পূর্ণ ফলবতী হয়ে উঠতে পারে নি। তবে সুখের কথা এই যে, আর-এক রেনেশাঁস-মানুষের সক্রিয়তায় রামেন্দ্রসুন্দরের অসমাপ্ত সাধনা যথার্থ পরিণতির দিকে পরিচালিত হয়, এবং এই মানুষ বাঙলা সাহিত্যজগতের পরশুরাম রাজশেখর বসু। রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের ষোলো বছর পরে রাজশেখর বসুর জন্ম হলেও লেখকরূপে 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের মাধ্যমে তাঁর আবির্ভাব রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর তিন বছর পরে। আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বাঙালি জনজীবনে বিপুল আলোড়ন তোলেন এবং তাঁর দীর্ঘ জীবনের বহুমুখী কর্মধারার মাধ্যমে তিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে আমাদের দেশে রামেন্দ্রসুন্দর-প্রবর্তিত ঐতিহ্যের তিনিই যোগ্যতম উত্তরসাধক। বস্তুত, জীবন এবং সাধনার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রাজশেখর বসুর মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত জীবনে আর কর্মক্ষেত্রে উভয়েই ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ, কর্তব্যনিষ্ঠ, নিয়মনিষ্ঠ এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ এক আদর্শ পুরুষ। দুজনেই ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, সাহিত্যসেবী ও সমাজসংস্কারক এবং সনাতনী ভারতীয় ঐতিহ্যে অনুরাগী, একই সঙ্গে সংযত আধুনিকতায় আগ্রহী। দুজনের রচনাতেই লক্ষ করা যায় ঋজুতা, পরিমিতিবোধ এবং পরিশীলিত রুচি। শুধু পার্থক্য এইখানে যে, লেখক হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের মূল মাধ্যম ছিল মননশীল প্রবন্ধ। অন্যদিকে প্রাবন্ধিক রাজশেখরের আর-এক সত্তা পরশুরাম ছদ্মনামের আড়ালে গল্পকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্মল হাস্যরসের প্রবাহে সমাজজীবনের সমস্ত আবর্জনা দূর করার দায়িত্ব পালন করেন।

## গ্রন্থসমালোচনা

আজকের বাঙালি সমাজে রাজশেখর বসুর এই ঐতিহাসিক কীর্তি বিস্মৃতপ্রায়। বস্তুত, বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছেই রাজশেখর বসু অপরিচিত অথবা উপেক্ষিত। এর কারণ এই যে, এই রেনেশাঁস-মানুষ তাঁর জীবনচর্যা আর সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে বাঙালির জন্য যে বলিষ্ঠ আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, তা গ্রহণ করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমাদের নীতিভ্রষ্ট আদর্শহীন জীবনে, আমাদের কর্মবিমুখ অভ্যাসের মূঢ়তায়, আমাদের ফাঁকি আর চালাকির মিথ্যা আড়ম্বরে রাজশেখর বসুর অসাধারণ কর্মনিষ্ঠা আর সুশৃঙ্খল জীবনধারা নিতান্তই বেমানান। একইভাবে সাহিত্যিক রাজশেখরের বিরাট প্রতিভাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে মানসিকতা আর মূল্যবোধ থাকা দরকার তা আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। পরশুরাম তাঁর অধিকাংশ হাসির গল্পেই প্রতিবাদ আর কটাক্ষের কুঠার হানতে চেয়েছিলেন সমাজের নানা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া তাঁর পরিবেশিত হাস্যরস অভিজাত রুচির উচ্চ চূড়া থেকে নেমে এসেছিল স্বচ্ছ ঝরনার ধারায়। প্রবল হাসি আর কৌতুকের মধ্যে শুচিতা রক্ষায় তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তাঁর হাস্যরসের এই অসামান্যতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আজ আমাদের নেই। কারণ আজকের দিনে চটুল আর তাৎপর্যহীন কৌতুককেই আমরা হাসির উপাদান হিসাবে গ্রহণ করি, এবং আমাদের চোখে হাসির গল্প হল তাৎক্ষণিক প্রমোদের উপকরণমাত্র। স্বভাবতই পরশুরামের মতো খাঁটি 'খনিজ সোনা' (এই অভিধায় তাঁকে ভূষিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ) আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরে।

এই পরিস্থিতিতে রাজশেখর বসুর জীবন তথা সাহিত্যের সঙ্গে বর্তমান বাঙালি প্রজন্মের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এক পবিত্র কর্তব্য এবং এই কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছেন শ্রীমতী কল্যাণী ঘোষ তাঁর এই গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বিবৃত হয়েছে রাজশেখরের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যসাধনা। তৃতীয় খণ্ডে লেখিকা বিশ্লেষণ করেছেন রাজশেখরের প্রবন্ধমালা এবং একই সঙ্গে বাঙলা বানান আর পরিভাষা, অভিধানসংকলন ও অনুবাদের ক্ষেত্রে রাজশেখরের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে রাজশেখর বসুর জীবনপঞ্জী ও উল্লেখযোগ্য পত্রাবলী। রাজশেখরের জীবনালেখ্য পরিবেশনে লেখিকার আন্তরিকতা আর তথ্যনিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। প্রভূত পরিশ্রম করে তিনি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন সূত্র থেকে। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় কী অসাধারণ মানুষ ছিলেন রাজশেখর বসু। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিরলস, নিরহংকার, সংযতবাক, সুভদ্র এবং এক রাজকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি-নির্ভরতা ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। খ্যাতি আর সাফল্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নম্রতা আর দীনতার ভাবে। অন্যদিকে পারিবারিক জীবনের দুঃখ-শোক তিনি সহ্য করেছিলেন সন্ন্যাসীর উদাসীনতায়। লেখিকা আরও দেখিয়েছেন যে কর্মজীবনেও, বিশেষ করে বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালকরূপে, রাজশেখর বসু তাঁর সুনিপুণ পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিপরায়ণতার মাধ্যমে নেতৃত্ব আর সাংগঠনিক দক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শ্রীমতী ঘোষের অন্তরঙ্গ বর্ণনায় ব্যক্তি রাজশেখরের এই বিশিষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীর পরিচয় লাভ করে যে-কোনো পাঠকই অভিভূত হবেন।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় খণ্ডের আলোচনাও যথেষ্ট তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণাত্মক। রাজশেখরের গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদকর্ম লেখিকা নানাদিক থেকে পর্যালোচনা আর বিচার করেছেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গত পরিপ্রেক্ষিত উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। এ ছাড়া পূর্বসূরী এবং সমসাময়িকদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে লেখক রাজশেখরের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার উদ্যমও প্রশংসনীয়। তবে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আলোচনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। বস্তুত, তথ্যপরিবেশনের ক্ষেত্রে লেখিকা যে দক্ষতা দেখিয়েছেন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, পরশুরামের হাস্যরস আলোচনা করতে গিয়ে লেখিকা হাস্যরসের প্রকারভেদের পরিপ্রেক্ষিতে পরশুরামের আঙ্গিক এবং প্রয়োগরীতির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে রাজশেখরের হাসির গল্পের সামাজিক মূল্য। রাজশেখরের হাসির গল্প নিছক কৌতুকের উপাদান নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই গল্পের মাধ্যমে লেখক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করে সমসাময়িক সমাজের গতিপ্রকৃতির ওপর তাঁর অভিমত পেশ করেছিলেন প্রচ্ছন্নভাবে। খুবই ভালো হত যদি লেখিকা রাজশেখরের কিছু গল্প বাছাই করে নিয়ে সেগুলির নিবিড় বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজশেখর বসুর এই প্রখর সমাজসচেতনতার ওপর আলোকপাত করতেন। আশা করব, গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণ প্রস্তুত করার সময় লেখিকা তাঁর এই ত্রুটি সংশোধন করে নেবেন।

**অমলকুমার মুখোপাধ্যায়**

# পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি ও রবীন্দ্রনাথ

**রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়**—শুভব্রত রায়চৌধুরী। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পনেরো টাকা।

'রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়' বইখানির মতো এমন একটি রসোত্তীর্ণ অথচ যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনা বহুকাল পড়ি নি। এ বইয়ের অভিনবত্ব—বহুমুখী চরিত্রবিশ্লেষণে, বিচারের আঙ্গিকে, আধুনিক পশ্চিমী চিন্তার অবতারণায়, ভাষার অনন্যসাধারণ লালিত্যে, সর্বোপরি রবীন্দ্রমানসের নবদিগন্তের উপলব্ধিতে।

গ্রন্থকারের ধারণা, 'চার অধ্যায়'-এর সাহিত্যিক শ্রেণীবিচার স্বতন্ত্র ধরনের। কারণ, এটি নাটক আর উপন্যাসের সমন্বয় বলে গ্রন্থকার মনে করেন। গ্রন্থকারের এই অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃজনপ্রতিভার একটি নতুন দিকের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সুতরাং এ বইয়ের বিচারবিশ্লেষণ যদি শুধু নাটক বা শুধু উপন্যাসের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে, তার রসাস্বাদন অপূর্ণ থাকবে। গ্রন্থকার বিস্তৃত নিপুণ আলোচনায় এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করেছেন। তার ফলে পাঠককে পুনরায় 'চার অধ্যায়' পড়বার প্রেরণা জোগায়।

পশ্চিমী সাহিত্যে দার্শনিক উপন্যাস একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সাহিত্যকীর্তি। টমাস মানের 'ম্যাজিক মাউনটেন', দস্তয়েভস্কির 'দি ইডিয়ট', রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তোফ', সার্ত্রের 'রোডস্

টু ফ্রীডম'—সবই দর্শনদৃষ্টিভঙ্গির উপন্যাস। 'চার অধ্যায়' সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যকীর্তি। ইন্দ্রনাথ, অতীন্দ্রনাথ আর এলা—এই তিনটি তারে বাঁধা 'চার অধ্যায়'। রবীন্দ্রপ্রতিভা এই তিনটি তারে যে ঝংকার তুলেছে তার ভেতর ধরা পড়েছে মানুষের জীবনবাদ, তার মূল্যায়ন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব সুরমূর্ছনার প্রকাশ। স্বল্পপরিসর তাই তার নাটকীয় গতি। গ্রন্থকার নানা দিক দিয়ে উপন্যাসটির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন এবং তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরবার প্রয়াসে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "এলার চরিত্রে রক্তমাংসের বাহুল্য নেই—তার চরিত্র সম্পূর্ণ অভাবাত্মক (নেগেটিভ)।" ইন্দ্রনাথ চরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমত, "ইন্দ্রনাথ লোকটির ব্যবহার যেমন দুর্বোধ্য, সেইরূপ পাঠকের পক্ষেও দুরধিগম্য—তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন তার্কিকতার অন্তরালে তাহার ব্যক্তিত্ব-রহস্যটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে।"

এই ধরনের আলোচনা কিছু-কিছু তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে শোনা যায়। এইসব কথা শুনলে একজন প্রখ্যাত বাঙালি শিক্ষাবিদের একটা কথা স্মরণ হয়—"রবীন্দ্রনাথের বাঙলাদেশে জন্ম বাঙালি জীবনে যেমন মহাসৌভাগ্যজনক, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমনি মহাদুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা।" বর্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার ইন্দ্রনাথ এবং এলার চরিত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন সে দিকে দৃষ্টিপাত করলে শ্রীকুমারবাবুর ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

গ্রন্থকার ইন্দ্রনাথের চরিত্রবিশ্লেষণে একেবারে স্বতন্ত্র পথ বেছে নিয়েছেন। ইন্দ্রনাথের চরিত্রে তিনি নীটশের স্থপারম্যান বা ওভারম্যান-এর ভাবকল্প দেখতে পেয়েছেন। নীটশের শক্তিতত্ত্বের যে অপব্যাখ্যা বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চার দশক ধরে, বিশেষ করে হিটলারি যুগে প্রচলিত ছিল, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নীটশে-বিশেষজ্ঞরা অভিসন্ধিমূলক এবং ভ্রান্ত বলে বাতিল করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের যুগে ওই ভ্রান্ত অপব্যাখ্যাই প্রচলিত ছিল, তাই রবীন্দ্রনাথেরও নীটশে-প্রীতি কিছু ছিল না। কিন্তু ইন্দ্রনাথের চরিত্র যে শক্তিতত্ত্বের উপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঙ্গে মিলে যায় নীটশের নবমূল্যায়নের ব্যাখ্যা। নীটশের শক্তিতত্ত্বের মূলমন্ত্র হচ্ছে আত্মক্রান্তি—"Man is something that should be overcome. What have you done to overcome him?"

সাধনাই বড়ো, ফলটা বড়ো নয়। আত্মক্রান্তি সেই সাধনারই ধ্রুব লক্ষ্য। নীটশেবিদ্বেষী রবীন্দ্রনাথ যে ইন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করলেন তাতেই পাওয়া গেল নব-ব্যাখ্যাত স্থপারম্যান-এর আভাস: একজন আত্মক্রান্ত পুরুষ যে সুখে বিচলিত হয় না, দুঃখে অসুস্থিরা থাকে, বিপদবাধাকে অতিক্রম করে হাসিমুখে, সাধারণের মধ্যে অস্ফুট অসাধারণত্বকে জাগিয়ে তোলাই যার ব্রত—আত্মতুষ্ট, সুমুপ্ত দেশের বুকে এক ঐতিহাসিক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে সে। এটাই তার কাজ। আশা যদি না-ই ফলবতী হয়, তাতেও শোক নেই। "ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে, কিন্তু মহাকাব্য তো বটে।" এটাই ইন্দ্রনাথের শেষ কথা।

ইন্দ্রনাথ একটি অনন্যসাধারণ চরিত্রসৃষ্টি। গ্রন্থকারের ভাষায়, "অহিংসা-শান্তি-সৌভ্রাতৃত্বের কবি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুকম্পা নিয়ে হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের মূল্যায়ন করেছেন, তা কেবল রবীন্দ্রনাথের মতো এক অতলান্তিক মহানুভব মানবিক চেতনার পক্ষেই সম্ভব।...বিপ্লবীর ভুলের মধ্যে যে নিবাত-নিষ্কম্প আদর্শনিষ্ঠার বিষাদগম্ভীর ভাব আছে তা বলিষ্ঠ রেখায় রূপায়িত হয়েছে ইন্দ্রনাথ-চরিত্রে। 'চার অধ্যায়' যে পক্ষপাতদুষ্ট সাহিত্যকীর্তি নয়, ইন্দ্রনাথই তার সুসংগত সুসম্বদ্ধ দীপ্তিমান নিদর্শন।" একথা সত্য যে এহেন ইন্দ্রনাথ হীনবীর্য বাঙালিপ্রাণে দোলা দেবে না (কারণ বাঙালি প্রাণকে আন্দোলিত করে মেঘনাদবধীন দেবদাস)। কিন্তু গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে বাঙালি পাঠকের কাছে ইন্দ্রনাথের চরিত্র একেবারেই দুরধিগম্য বলে মনে হবে না।

এলা নারী। কিন্তু সে নিজের নারীসত্তার জন্য লজ্জিত। নারীর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি তার চরিত্রে কঠোরভাবে অবদমিত। ইন্দ্রনাথ তাকে বুঝিয়েছিলেন, "ভালোবাসার গুরুভার তোমার ব্রত ডোবাতে পারে এমন মেয়ে তুমি নও।" তার আবাল্যসঞ্চিত সংস্কার ইন্দ্রনাথের কথায় প্রতিধ্বনিত হল। তার নারীসত্তা কঠিনভাবে ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু কঠিনতর সত্যের আঘাতে যেদিন তার নারীসত্তা মিথ্যা আবরণ ভেদ করে জেগে উঠল, সে জানল সে অতীন্দ্রের। যে দেহ ছিল তার কাছে বায়োলজির সংকল্প-বাহক, অসম্মানের আধার সেই দেহই হয়ে উঠল দেবালয়। অতীন্দ্রকে যা সে দিতে পারে নি তা দেবার জন্য মনপ্রাণ আকুল হয়ে উঠল। গ্রন্থকারের ভাষায় "এলার শেষ চুম্বন অফুরান হল মৃত্যুর অসীমতায়।" এলার সংস্কারগুলি কেন কিভাবে গড়ে উঠেছিল এবং কোন্ আঘাতে তা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল, তার বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা করেছেন গ্রন্থকার।

স্থানাভাবে অতীন্দ্র-চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা গেল না এই নিবন্ধে। কারণ আরও প্রয়োজনীয় দু-চারটে কথা বলতেই হবে।

এই গ্রন্থে 'চার অধ্যায়'র প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। প্রেক্ষাপটের দুটো দিক: স্বদেশমুক্তি এবং হিংসামুখীনতা। স্বদেশপ্রেম বিষয়ে রবীন্দ্রচিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তাঁর কাছে স্বদেশ কেবল একটা ভৌগোলিক ভূখণ্ড নয়। স্বদেশ একটা আদর্শের ভাবকল্প যার মধ্যমণি হল মানবিকতা। তাই স্বদেশপ্রেম যখন হিংসার আশ্রয় নেয় সেটা হয় অমানবিক। তাই অতীন্দ্র বলেছিল, "পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকা।" এই প্রসঙ্গে সলঝেনিৎসিন-এর দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন: "এ যেন চারযুগের ওপার হতে ভেসে আসা অতীন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি।" সলঝেনিৎসিন-এর মনোভাব সম্বন্ধে স্টিফেন কার্টার "স্ব পলিটিকস অব সলঝেনিৎসিন" গ্রন্থে লিখেছেন, "As such it (patriotism) can be seen as a noble emotion, which raised up the spirit of man and inspires him in some way to enrich the human race as a whole."

গ্রন্থকার পশ্চিমের আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে চার অধ্যায়-এর পটভূমির সন্ধানবাদের মূল্যায়ন করে লিখেছেন, "পরিবেশ এমন বিষিয়ে উঠেছে যে যারা এই পরিবেশে বড় হচ্ছে তাদের কাছে হিংস্রতা একটি স্বাভাবিক প্রবণতা বলে গৃহীত হচ্ছে।" ফলে, আধুনিক সমাজে বীভৎস রসের প্রভাব উত্তরোত্তর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।" "চার অধ্যায় সত্য সত্যই এই পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী।"

আর-এক দিক থেকেও উপন্যাসটির যুগোপযোগী প্রাসঙ্গিকতার কথা বলেছেন গ্রন্থকার। সেটা হল আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যাকে বলা হয় 'এক্‌জিসটেনশিয়ালিজ্‌ম্'। কয়েকটি ধারণা অস্তিবাদী চিন্তার মৌল উপাদান; যেমন আউটসাইডার, অথেনটিসিটি, ফ্রীডম, বিকামিং, রেসপনসিবিলিটি, একজিসটেন্‌স্, এসেন্‌স্, অ্যাংগুইশ ইত্যাদি। এই ধারণাগুলি অস্তিবাদে এত প্রাধান্য পেয়েছে যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ঐতিহ্যবাদী ধারা থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা আসন দাবি করে। এই ধারণাগুলির প্রায় সবকটিই 'চার অধ্যায়ে'র তিনটি চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সবচেয়ে প্রধান ধারণা হল 'বিকামিং'। গ্রন্থকার যাকে আত্মক্রান্তি বলেছেন। এদিক থেকেও 'চার অধ্যায়' সমকালীন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ভারতবিশেষজ্ঞরা এদেশকে অধ্যাত্মবাদী দেশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাই পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য চিন্তাধারার প্রতিনিধি বলে পরিচিত। কিন্তু একালের ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা অন্য কথা বলছেন। যেমন এ. এল. ব্যাসম তাঁর বিখ্যাত 'স্ব ওঅনডর স্যাট ওয়জ ইনডিয়া' গ্রন্থে মন্তব্য করছেন, "Too many indologists have studied religious art, language and literature in a political and historical vacuum and this has tended to encourage the widespread fallacy that Indian civilization was interested solely in the things of the spirit."

রবীন্দ্রমানসে শুধু ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের প্রভাব পড়ে নি, অনেক বিদেশী চিন্তার প্রভাবও পড়েছিল। আজ সমাজের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ পালটাচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার নবমূল্যায়ন প্রয়োজন। এই মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিত হবে প্রতীচ্যের আধুনিক চিন্তাধারা, প্রণালী হবে পশ্চিমের র‍্যাশন্যালিসটিক টুল্‌স্। একথা মানতেই হবে যে, পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা আজ বিস্মর্তব্য। তাই গ্রন্থকার সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, "বর্তমান মূল্যায়নপ্রয়াস প্রতীচ্যের দৃষ্টিকোণ দ্বারা প্রভাবিত।" সত্যিই নতুন রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কারের দিকে পদক্ষেপের সূচনা পাওয়া যায় "রবীন্দ্রনাথ ও চার অধ্যায়" গ্রন্থে।

**অনিরুদ্ধ চৌধুরী**

# পুরাতত্ত্বের ভগ্নস্তূপেই নতুন বিপ্লবের শেষ ?

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ছয়-এর দশকের শেষে, সারাপৃথিবীজোড়া এক প্রচণ্ড হুলুস্থুল বেঁধেছিল তরুণ আর ছাত্রদের মধ্যে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় অনবরতই তো বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলেছে : নয়া-উপনিবেশবাদের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী সদ্য-স্বাধীন দেশগুলো যে আসলে নাম বা ভোল পালটে চেষ্টা করেছে পুরোনো ব্যবস্থাটিকেই জীইয়ে রাখতে, বেশির-ভাগ বিক্ষোভই আসলে তার বিরুদ্ধে : সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোয় শাসকরা হয়তো এখন কালো বা খয়েরি, কিন্তু মুখোশটি শাদা—কেননা 'প্রাক্তন' প্রভুরা আপাতদৃষ্টিতে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় নিজেদেরই আদলে গড়া বাধ্য আর বশম্বদ কালো বা খয়েরিদের বসিয়ে যায় মশনদে—হাকিম নড়ে, কিন্তু বিধিব্যবস্থা পালটায় না—এ যেন চৌশায়ার বেড়াল হাওয়া হয়ে যাবার পর ফেলে রেখে গেছে তার চোখ-মটকানো আর টিটকিরি-মেশানো হাসির খিলিক। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য আর শ্রেণীবৈষম্য, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, এইড কনসরটিয়াম, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, নিজের এবং নিজের বংশধরদের আখের গোছানো, নেরুদণ্ডবিহীন চামচাশ্রেণী—এ-সব পর-পর উল্লেখ করে সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বিক্ষোভ, ঘেষবিদ্বেষ, খেয়োখেয়ি ইত্যাদির একটা ব্যাখ্যা খাড়া করা যায়। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলনগুলো ৬৮-৬৯এ শুধু এ-সব দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ায়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলোয়, তার প্রচণ্ড জের চলেছিল। মারকিন মুলুকের তরুণদের ধরে-ধরে পাঠানো হচ্ছিল ভিয়েৎনামে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণার টাকা দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মাথা কিনে ভাও কেমিক্যালসের মতো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করছিল নেপাম প্রভৃতি, নতুন সব শব্দ গজিয়ে উঠছিল মারকিন দেশের আবহাওয়ায়—ড্র্যাফট উজার বা ড্রপআউট, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিদঘুটে অলংকার ও বাহ্বাস্ফোট-বহুল ভণ্ড বস্তাপচা কথাবার্তা—যাকে ইংরেজিতে বলে ক্যান্ট্, মুখে এক মনে আর, কিউবা অবরোধ, বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, দারিদ্র্য, গ্রহণ-অযোগ্য আইনকানুন-ইত্যাদি সব মিলিয়ে যা তৈরি হয়েছিল তাকে দান্তের নরকেরও অধম মনে হচ্ছিল ছাত্রদের কাছে। মারকিন দেশ থেকে তারা পালিয়ে চলে যাচ্ছিল ক্যানাডায় বা আরো সব দেশে, নিজেদের দেশেও মার্চ হচ্ছিল, বিক্ষোভ, গুলি করে মারা হচ্ছিল—না, বিপ্লবী কাউকে নয়, সংস্কারসমর্থক মার্টিন লুথার কিংএর মতো মানুষদের, কিন্তু অচলায়তনকে নড়াতে, পালটাতে বা ভাঙতে যা জরুরি হয় সে-রকম কোনো দেশজোড়া বড়ো আন্দোলন গজায় নি অবশ্য।

কী দেখেছিল এই তরুণ আর ছাত্ররা ? দেখেছিল এই ব্যবস্থা পুরোপুরি ভণ্ড—রিপাবলিকপন্থী বা ডেমোক্রাট, কেউই সাধারণ মানুষের জন্যে নয়। ফ্রান্সে যখন আনদ্রে মালরো—অনেক হামবড়া বাগাড়ম্বর তাঁর অভ্যেস ছিল—

## বিশ্বসাহিত্য

ফ্রান্সের সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা, তখন ফ্রান্সের জাতীয় নাট্যশালায় ছাত্রদের আশ্রয় দেবার জন্যে পরিচালক-নাট্যকার ও অভিনেতা জাঁ লুই বারোর চাকরি খেয়েছিলেন—অনায়াসেই, চোখের পাতা না-ফেলেই, ক্যান্ট্ না-পালটেই। এ-রকম আরো সব নজির অন্য অনেক দেশেও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয়, এমনকী রুশদেশেও গা-ঢাকা-দেয়া ছাপাখানার সৌজন্যে একসময়ে গোপনে হাতে-হাতে ঘুরেছিল ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো, আনদ্রেই ভজনেসোন্স্কি বা আরো অনেকের কবিতা—অবশ্য একটু পরেই সরকারিভাবে তাঁদের কবিতা প্রকাশ করা হতে থাকে। মারকিন মুলুকে—সরকারি বিবরণেই প্রকাশিত—তরুণ আর ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনাকে পুরোপুরি ধুলোয় মিশিয়ে দেবার জন্যে আরো অনেকের সঙ্গেই রকেফেলাররা কোটি-কোটি ডলার বিলিয়েছিল তথাকথিত ধর্মপ্রচারসংস্থাগুলোয় : ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল জিহোভাস উইটনেস, কৃষ্ণ কনশাসনেস, গুরু, মহাঋষি, অমুক যোগী তমুক স্বামী, তমুক মহারাজ—আর তাদের অকাতরে টাকা জোগানো হয়েছিল। আর উদারনীতির আড়ালে, পারমিসিভনেসের সাজ পরে, বড়ো-বড়ো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তুরস্কে, লাতিন আমেরিকায়, ফিলিপিনসে চাষ করেছিল আফিমের—তৈরি করা হয়েছিল ড্রাগ কালচার। ছিল রুমাল, হয়ে গেল এক বেড়াল—ছিল বিক্ষোভপ্রতিবাদ, হয়ে গেল ভজন কীর্তন আরাধনা। সুপরিকল্পিতভাবে, সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে, তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হল কোকেন, হেরোয়িন, ব্রাউন শুগার, স্ন্যাক, ক্র্যাক ইত্যাদি চমকপ্রদ হত্যাকারীদের। এখনও, যদি জিগেস করেন, বলিভিয়া, মেকসিকো, হন্ডুরাস ইত্যাদি দেশের গাঁজা, আফিম, কোকেনের প্ল্যানটেশনগুলোর মালিক কে, তাহলে পর-পর বহু মারকিন সংস্থার নাম শুনে মুক্ত দুনিয়ার চমকপ্রদ মুক্তিবিতরণ সম্বন্ধে আপনি যৎপরোনাস্তি চক্ষু ঢুলুঢুলু করে বুঁদ হয়ে থাকতে পারবেন। গানের দলগুলোর ড্রাগ কেলেঙ্কারি ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যমগুলো, যাতে আরো তরুণদের মুণ্ডগুলো চিবিয়ে খাওয়া যায়। যদি জিগেস করেন এই-সব প্রতিষ্ঠানবিরোধী গানের কলিগুলোর রেকর্ড বা অ্যালবাম প্রকাশ করে কারা, টপ টুয়েনটির নাম করে কারা তাদের মহাজন বানিয়ে দেয়, তাহলে ই-এম-আই, সি-বি-এস ইত্যাদি বহুজাতিক সংস্থা ছাড়া আর কার নাম আপনি শুনতে পাবেন, একবার বোধহয় ভেবে নেয়া যায় এই ফাঁকে। এত সব বাহাদুর পরিকল্পনা সত্ত্বেও যদি কোনো-কোনো দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিক্ষোভ বেঁচে থাকে, তবে সারাক্ষণ এদের মোকাবিলা করবার জন্যে তো আছেই পুলিশ, প্যারামিলিটারি বাহিনী, পুরো সামরিক ব্যবস্থাটাই—এবং হাতে-গড়া সব লুম্পেন খোচর ও আনুষঙ্গিক মহাস্নাবা। ইতিহাসবিদ, পুলিশের কর্তা, নৃতত্ত্বের পুরোহিত—তাকে দমন পীড়নে পোক্ত করবার জন্যে আন্তর্জাতিক কৃষিসম্মেলনের ছুতো করে পাঠিয়ে দেয়া যায় খোদ ওস্তাদদের কাছে। ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকায়, যে-দেশের ডলারে ছাপা থাকে এই বাণী : 'ইন গড উই ট্রাস্ট্'। শিখে এসে সেই দমন-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তুপামারোদের ওপর, বা সি-পি-এম কর্মীদের ওপর, বা নকশালপন্থীদের ওপর। কিংবা যদি দেখা যায় বড্ড অস্বস্তিকরভাবে মার্কসবাদী চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছে, তবে সেসব জায়গায় লেলিয়ে দেয়া যায়—গোপনে বা প্রকাশ্যেই—বিভেদপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদ। ভারতবর্ষের ভুক্তভোগীদের কাছে অবশ্য এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই।

২

এত কাহুন্দি ঘাঁটার দরকার হল ডক্টর বেদিতান্তিরিগে এডিরিভিরা শরচ্চন্দ্রের উপন্যাস 'সাঙ্কা আইন ও পূর্ণিমাচাঁদ' (কারকিউ আনড এ ফুল মুন) সম্বন্ধে আলোচনা ফাঁদতে গিয়ে। এ-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে এ নিছকই ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত। শরচ্চন্দ্র এককালে ইউনিভারসিটি অফ সিলোনে আধুনিক সিনহলি সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পলেখক, নাট্যকার, সমালোচক, গীতিনাট্যপ্রযোজক। একসময় তিনি ফ্রান্সে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতও ছিলেন।

শরচ্চন্দ্র কেরালার সাহিত্য অ্যাকাডেমি থেকে কুমারন আহসান আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, যেমন এ-পুরস্কার আরো পেয়েছেন সেনেগলের লেওপোল্ড সিঙার সেংহর বা কিউবার কবি নিকোলাস গ্যিয়েন (তাঁর 'চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা' তর্জমা করেছেন শঙ্খ ঘোষ)।

'সাঙ্কা আইন ও পূর্ণিমাচাঁদ' ১৯৭৮এ সিনহলি ভাষায় বেরিয়েছিল। পরে লেখক স্বয়ং একটি ইংরেজি সংস্করণ তৈরি করেছেন—হাইনেমান-কর্তৃক 'রাইটিং এন এশিয়া' গ্রন্থমালায় সে-ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছে ; যেমন হাইনেমান এরই পাশাপাশি 'স্টোরিজ ফ্রম শ্রীলঙ্কা' নামে গুণরত্ন-সম্পাদিত একটি ছোটোগল্পের সংকলনও প্রকাশ করেছেন—যাতে সিনহলি (সেগুলো অনুবাদ) ও ইংরেজি ভাষায় লেখা নিম্নোক্ত লেখকদের ১৮টি ছোটো গল্প বেরিয়েছে :—জিনদাস বিজয়তুঙ্গ, মার্টিন বিক্রমসিংঘে, গুণদাস অমরশেখর, চিত্রা ফারুনান্দো, জেমস গুণবর্ধনে, অ্যান রণাসিংঘে, এ. ভি. সুরবীর, পুণ্যকাণ্ডে বীজনায়কে, অশোক কোলোম্বাগে, তিলক গুণবর্ধনে, সুবিমলী গুণরত্ন। এর মধ্যে আমি যদুর জানি চিত্রা ফারুনান্দো-রচিত 'মিসিলিন' গল্পটি অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরজমায় 'সচেতনা' সংকলনে বেরিয়েছে।

Ediriwira Sarachchandra, *Curfew and a Full Moon*, Heinemann, Hong Kong,

Yasmine Gooneratne (ed), *Stories from Sri-Lanka*, Heinemann, Hong Kong.

৩

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, এক জায়গায়, একটি পোস্টার :

একজন বিপ্লবী নেতা
এঁকে তাকিয়ে দেখুন
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারার
মাস মাইনে
৭০০ টাকা

৪

'সান্ধ্য আইন ও পূর্ণিমা চাঁদ'-এর বিষয়বস্তু ও পটভূমি এপ্রিল ১৯৭১এ ইউনিভারসিটি অভ সিলোনের ছাত্র-অভ্যুত্থান। শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়কে—মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও—রুদ্ধশ্বাস বেগে—হয়তো প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সুপরামর্শক্রমেই—লাগাম খুলে লেলিয়ে দিয়েছিলেন বেপরোয়া পুলিশ আর সেনাবাহিনী—এবং তারা যতরকমভাবে সম্ভব, ছলে-বলে-কৌশলে, মেরে-ধরে-অত্যাচার করে, সেই ছাত্রবিক্ষোভকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। সত্য ঘটনা এটাই, তৎকালীন সমস্ত সরকারি নথিপত্র একটু ঘাঁটলেই তথ্যগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু উপন্যাস স্বভাবতই কোনো নথি নয়, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় পরিবেশ আর পটভূমি, চরিত্র আর ঘটনা, মানস পরিমণ্ডল আর অন্তর্লীন টানাপোড়েন। অন্তর্ঘাতের আবহাওয়া, আরণ্যবিক্ষোভ আর নির্দয়প্রখর উৎপীড়ন—সব উপন্যাসে যথাযথ ফুটে উঠেছে—এ-কথা বললে নেহাতই কম বলা হয়, সাহেবি আন্‌ডারস্টেটমেন্টের চেয়েও কম। কেন, সে-প্রসঙ্গে একটু পরেই আসা যাবে।

৫

উপন্যাসের এক জায়গায়, যে দিবসের মিছিল দেখতে-দেখতে, পথচারী দর্শকদের কথাবার্তা :

'আরে! উনি অধ্যাপক অমরদাস নন?'

'হ্যাঁ। তা-ই তো, উনিই তো! অবিশ্বাস্য!'

'কেন? ওঁর তো সবসময়েই বামপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি ছিল, তা-ই না?'

'বাজে কথা! উনি কস্মিনকালেই পাকা একজন বুরজোয়া ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।'

'উনি তো রাজনীতিবাজদের নিয়ে সবসময় ঠাট্টা করতেন!'

'তবু সহযাত্রী একজন—ফেলোট্রাভেলার।'

'কোন দল?'

'ট্রটস্কিপন্থী।'

'কমিউনিসট।'

৬

শ্রীলঙ্কার সামাজিক বিন্যাস এবং পরিবেশ, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে, একেবারে ঘরের কাছের দেশ হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালি পাঠকদের সম্ভবত কোনো পরিচয় নেই, যতটা পরিচয় আছে ইংল্যানড, ফ্রানস, জারমানি বা মারকিন দেশের হালচাল কেতাদস্তর সম্বন্ধে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর শেষতম কেচ্ছাকেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে নবীনতম নেশার দ্রব্যের প্রতি আমাদের আহামরি আসক্তি সর্বজনবিদিত। এ-প্রসঙ্গটা গোড়ায় একবার বুড়ি ছোঁবার মতো বলে যাওয়া হয়েছে, অতএব সে-সম্বন্ধে নতুন করে আর কিছু যোগ করার তেমন দরকার নেই, যদি-না ফ্রানজ ফানঁ, বা পাউলো ফ্রেইরি, বা আউগুস্তো বোয়াল, বা এমে সেজেয়ার প্রমুখ তাত্ত্বিকদের রচনার দিকে অভিনিবেশ আকর্ষণ করা যায়। শ্রীলঙ্কা ইংরেজ আমলে (তখন তার নাম অন্য ছিল) এককালে দিল্লি থেকে শাসিত হত বটে, কিন্তু সত্যি-সত্যি বিজয়সিংহ নামে কোনো টগবগে তরুণ কখনও সে-দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে যান নি বলেই বোধহয় আমরা সে-দেশ সম্বন্ধে খুব একটা কিছু জানবার চেষ্টা করি নি। প্রয়োজনও নিশ্চয়ই বোধ করি নি। যদিও এখন শ্রীলঙ্কা খবরকাগজের নিত্য শিরোনাম।

অন্তত উপন্যাসটিকে বোঝবার জন্যে ১৯৭১-এর শুমারি প্রতিবেদন থেকে কতগুলো তথ্য উদ্ধার করা যাক : শ্রীলঙ্কার আয়তন ৬৫,৬১০ বর্গ-কিলোমিটার; লোকসংখ্যা (তখন ছিল) দেড় কোটি; ভাষা : সিন্‌হালা, ইংরেজি, তামিল; নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী : সিনহলি (শতকরা ৭৫ ভাগ), তামিল, মুর, বুর্ঘের। বিদেশে তারা প্রধানত যা রপ্তানি করে তা হল : চা, রবার, নারকোল থেকে তৈরি নানা দ্রব্য, কৃষ্ণসীস ওরফে গ্র্যাফাইট। কন্যাকুমারী থেকে শ্রীলঙ্কার দূরত্ব মাত্র ৩২ কিলোমিটার। পৃথিবীতে যত







কৃষ্ণসীস, তার সবচেয়ে বেশি অংশ পাওয়া যায় শ্রীলঙ্কায়, এ ছাড়া আছে জহরিদের প্রিয় বহুবিধ মূল্যবান রত্নপাথর। দ্বীপের শতকরা ৪৩ ভাগ জঙ্গল, সেখানে আবলুশ বা ওই-জাতীয় শক্ত কঠিন কাঠ পাওয়া যায়। উত্তরে আছে জাফনা, উত্তরপূর্বে সমুদ্র ঘেঁষে ত্রিকোমালি, যে-দুটো জায়গার নাম আজকাল ঘন-ঘন কাগজে বেরোয়, যেহেতু তামিলনাড়ু থেকে তাদের দূরত্ব খুবই কম। এ ছাড়াও শ্রীলঙ্কার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব এটাই যে ভারত মহাসাগরে পাহারা দেবার জন্যে রণকৌশল ফাঁদবার জন্যে এই দ্বীপটিকে কুক্ষিগত করে রাখা জরুরি।

তৃতীয় বিশ্বের যে-কোনো দেশের মতোই—কিংবা অনেক দেশের চাইতে আরো বেশিভাবেই—শ্রীলঙ্কায় বিষম শ্রেণীবৈষম্য বর্তমান। যাদের আছে প্ল্যানটেশন, অর্থাৎ রবারখেত, চা-বাগান, নারকোলবন, বা আবলুশ কাঠের জঙ্গল, যাদের আছে কৃষ্ণসীসের খনি কিংবা ভিনদেশী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কারখানা শিল্পদক্ষতর—তাদের ধনসম্পদের পরিমাণ আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে কল্পনাতীত। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় শ্রেণীটিকে বাদ দিলে, দেশের বেশির-ভাগ লোক, কি সিনহলি বা কি তামিল, বাস করে দারিদ্র্যসীমার দুঃসহ নীচের তলায়। দ্বীপকাল এই দ্বীপে শিক্ষাব্যবস্থাটি পুরোপুরি দখল করে রেখেছে বিত্তবানেরা—আছে বিলেতের পাবলিক স্কুলের কায়দায় কিংবা আমাদের দেশের দুন স্কুলের কেতায় কিছু স্কুল—সেখানে 'বড়োলোকদের' ছেলেরা পড়ে। সাধারণ লোকদের স্কুলে কী পড়াশুনো হয়, সেটা ভারতের স্কুলব্যবস্থা দেখলেই যে-কেউ যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারবেন—হয়তো তা ভারতের চেয়েও খারাপ। অতএব যেমন সংবিধান আউড়ে ভজানো হয় যে সবাই সমান, সেটার বুজরুকি সহজেই ধরে ফেলা যায় : গরিব ঘরের কেউ যে ভালো পড়াশুনো করে কোনো পেশা বেছে নেবে, উকিল, ডাক্তার, এনজিনিয়ার হবে—সে-আশা সুদূরপরাহত। সমস্ত পেশাই বিত্তবানদের হাতে। যারা ধনকুবের তারা অবশ্য আরো-এককাঠি সরেশ—তারা দেশে নয়, বিলেতের পাবলিক স্কুলেই ছেলে পড়ায়, মেয়ে পড়ায় সুইস্‌সারলানডে ফিনিশিং স্কুলে। দেশি পাবলিক স্কুলে আসে প্রধানত মুদালালিজের ছেলে-পুলেরাই—মুদালালি অর্থাৎ বেনে, কোনো স্টোরের মালিক কিংবা আর-কোনো ব্যাবসা আছে তার, সে কালোবাজারে জিনিশ বেচে, বিস্তর মুনাফা লোটে, কালো টাকা জমায়। এসব দেশি স্কুলের ধরনটা একেবারেই সাহেবি। শ্রীলঙ্কার সেরা কিছু লেখক যে শুধু ইংরেজিতেই লেখেন, স্টোরিজ ফ্রম শ্রীলঙ্কার পাতা ওলটালেই যেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে, সেটা হয়তো শিক্ষাব্যবস্থার এই তথ্য থেকেই স্পষ্ট ফুটে উঠবে। এসব স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়ান, তাঁদের বিলিতি ডিগ্রি আছে আর তকমা আছে, গাড়ি-বাড়ি আছে, অনেকেরই মেমসাহেব বউ আছে, আর ফ্যাকালটি ক্লাবে বিস্তর স্কচ আর মুখরোচক কেচ্ছা আর ফুর্তি আছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসটির খানিক দূর অব্দি এগুলেই এই চেহারাটা গ্র্যাফিকভাবে যদি বা নাও হয়, বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠবে।

৭

এহেন শ্রীলঙ্কায় মোটামুটি একটা বড়ো ঐতিহ্যই গড়ে উঠেছিল মার্কসবাদী আন্দোলনের। কিন্তু চাকার মধ্যেও চাকা থাকে, আবর্তর মধ্যে বহু আবর্ত, বিপ্লবের এক ধারণার মধ্যে আরো নানা ধারণা। অন্য অনেক দেশের মতোই মার্কসবাদীরা নানা দল আর শিবিরে বিভক্ত। তাদের একটা বড়ো অংশ চতুর্থ আন্তর্জাতিকের উৎপজন—ট্রটস্কিপন্থী। আছে চে গেভেরার অনুরক্তেরা, মাওপন্থীরা। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এসব দলেরও এক মস্ত ভূমিকা আছে, যেটা মনে রাখা উচিত।

সাতের দশককে মুক্তির দশক বলে ভেবেছিল কেউ-কেউ। মাওঝেদং আর তাঁর লাল পুথি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শরৎচন্দ্র যে ছাত্র-অভ্যুত্থানের বিবরণ দিয়েছেন, তাতে এই গোটা অস্থির চঞ্চল আবহাওয়াটাই ফুটে উঠেছে; এটা নিছক কোনো বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন ঘটনা নয়—পুরো আন্তর্জাতিক অস্থিরতারই এক প্রকাশ। এটা স্বভাবতই শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েকের পছন্দ হয় নি; অভ্যুত্থানটিকে কঠোরকঠিন উৎপীড়ন মারফত দমন করা হয়। কিন্তু তবু হয়তো তাঁর সমাজতান্ত্রিক অলংকৃত বুলি বিদেশী শক্তিদের কারু পছন্দ হয় নি, তাই তাঁকে পরে সরে যেতে হবে মারকিনদের তাঁবেদার জয়েবর্ধনেকে জায়গা করে দিয়ে।

কেনিয়ায় ভারত মহাসাগরের উপকূলে নৌবহরের একটা মস্ত ঘাঁটি আছে; তারই মুখোমুখি, ভারত মহাসাগরের এদিকটায় যে-ঘাঁটি চাই, সম্ভবত সেটাও বন্দরনায়েকের অপসারণের কারণ।

উপন্যাসের পশ্চাৎপটে এইসব আছে, আগেই বলা হয়েছে; বিষয়বস্তুরও খানিকটায় এ-সবকিছুর কিঞ্চিৎ স্ফুরণ আছে; তবে এইই কিন্তু পুরো উপন্যাস নয়। উপন্যাসটা গড়ে উঠেছে পেরাদানাইয়া ক্যাম্পাসকে ঘিরে—আর প্রধান চরিত্র কিন্তু ছাত্ররা নয়, বরং পুরাতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাসের নিরীহ নির্বিরোধী অধ্যাপক অমরদাস।

৮

আজকের পৃথিবীতেও এমন অনেক লোক আছে, যারা অনায়াসেই বলতে পারে, 'আমি বাপু রাজনীতি-টিতি বুঝি না, আমি ওসবে নেই,' আর এই বলে নিশ্চিন্তে থেকে যেতে পারে তাদের নিজেদের দৈনন্দিন কাজের ঘেরাটোপে বন্দী, যতক্ষণ না সরাসরি নিজের গায়ে আঁচ লাগে। অধ্যাপক অমরদাসও এইরকমই একজন, খানিকটা নাঈভ, সাতে-পাঁচে নেই, রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই নেই, তিনি জানেন, শুধু প্রাচীন ভাঙা পাথর, মূর্তি, পালি, ইতিহাস। পেরাদানাইয়া ক্যাম্পাসেই তাঁর কোয়ার্টার, স্ত্রী আছেন, একটা গাড়ি আছে, মাঝে-মাঝে ফ্যাকালটি ক্লাবে যান, বইপত্রেই ডুবে থাকেন বেশির-ভাগ সময়। বিপ্লবের কথা শুনলে, অগ্নিবর্ষী জ্বালাময়ী বক্তৃতা বা স্লোগান শুনলে কখনও সম্মেহে একটু মৃদু হাসেন, বাস, এই পর্যন্তই। তবে তাঁর মনের মধ্যে কোথাও যেন ছোট্ট একটা বোধ আছে যে সব ফেরেব্বাজ আর বাঁটপাড় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র বামপন্থীরাই অনেক বেশি সৎ আর নিষ্ঠাবান, অন্ততই তারাই, নিজের আখের না-গুছিয়ে, দেশের জন্যে আত্মত্যাগ বা আত্ম-বিসর্জনে রাজি। গত নির্বাচনের ফল বেরুলে এক-আধবার খানিকটা উপরোধে, খানিকটা কৌতূহলবশত সভাটভায় গিয়েছিলেন—তাও এদের প্রতি একটা অস্ফুট শ্রদ্ধার ভাব আছে বলে। নইলে তিনি সমকালীন জগৎ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ-কোনো ঔৎসুক্য নেই, খবর রাখারও প্রয়োজন বোধ করেন না। সারাক্ষণ তাঁর পুরাতত্ত্ব এবং প্রাচীন ইতিহাস নিয়েই তন্ময় আর মগ্ন থাকেন। সেই কবে ছেলেবেলায় বি-এ পাশ করার আগে যখন আনকোরা এক আন্‌ডারগ্র্যাজুয়েট, উঁচু ক্লাসের ছেলেদের র‍্যাগিং-এর পাল্লায় পড়েছিলেন; সেইসময় একবার এক বামপন্থী নেতার দুর্ধর্ষ সংবর্ধনা দেখেছিলেন তিনি, আর আবছাভাবে সে-দৃশ্যটা এই মধ্য বয়সেও তাঁর মনে আছে, পুরোপুরি ভুলতে পারেন নি।

এমন-যে অধ্যাপক অমরদাস, নিরীহ নির্বিরোধ উদাসীন, নিজের পড়ানোর বিষয়, পালি, পুরাতত্ত্ব, ধ্বংসস্তূপ ইত্যাদিতে তন্ময়—ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো, পড়াশুনো ছাড়া মাঝে-মাঝে এক-আধটু খবর নেন তাদের, এই ট্রপিক্যাল দ্বীপের চমৎকার ভূদৃশ্যের মধ্যে ভালোই আছেন মোটামুটি—এমনকী সাফল্য সম্বন্ধেও তাঁর কোনো মোহ বা চোরাটান নেই।

আর তারপর ১৯৭১-এ ক্যাম্পাসের মধ্যে সব ফেটে পড়ল বিস্ফোরণের মতো। ছাত্ররা—অমরদাস ক্রমে-ক্রমে আবিষ্কার করছেন—তেমন যেন আর নেই, ক্রমেই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসের চাপা উত্তেজনা তেমন আর চাপা নেই এখন, চে গেভেরা, মাওয়ের রেডবুক আর ট্রটস্কিপন্থীদের আগুনবর্ষী কল্পনা কেমন যেন রাতারাতি বদলে দিয়েছে আস্ত ক্যাম্পাসটাকে, ফ্যাকালটি ক্লাবে আর বিলিয়ার্ড রুমে আর তেমন স্বস্তি নেই, নির্বিবোধ ঝলমলে ফুলে ভরা গাছপালাও কেমন অলুক্কুনে হয়ে উঠছে, ঝোপে-ঝোপে পুলিশ—বা কখনও পলায়মান ছাত্র। এরই মধ্যে ছাত্রদের নিয়ে তিনি বেরুলেন শিক্ষা-সফরে—ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে পড়া উপন্যাসের কাঠামোর জন্যেই জরুরি ছিল—পুরোনো মঠ-মন্দির, বিহার, স্থাপত্য, ধ্বংসস্তূপ দেখতে। কিন্তু ছাত্ররা ক্রমে-ক্রমে সরে গেছে অ্যাকাডেমিক কৌতূহল ও ক্রিয়াকলাপ থেকে, জড়িয়ে পড়েছে বিপ্লবী রাজনীতিতে। ছাত্রদের শিক্ষা-সফরের বদলে এই সফর হয়ে ওঠে—আস্তে-আস্তে—স্বয়ং অমরদাসেরই শিক্ষাসফর—এখন পাঠ নিতে হবে সমকালীন জীবন থেকে। সাবেক ইতিহাস থেকে নয়।

৯

শরচ্চন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই যে সবকিছুই তিনি সহজে, দু-একটি অঙ্গুলিঙ্গ মারফত, আমাদের কাছে স্পর্শসহভাবে চাক্ষুষ করে তুলতে পারেন। চরিত্ররা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে রক্ত-মাংস সমেত, এমনকী তাৎক্ষণিক দেখা-দেয়া ছোটোখাটো চরিত্ররা শুদ্ধ। কিন্তু আরো যেটা কৃতিত্বের, সেটা অমরদাসের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের বিবরণ; অনায়াসেই নিখুঁত যাথার্থ্যের সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তোলেন অমরদাসের মানসজগৎ।—অমরদাসের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, কৌতূহল, বিশৃঙ্খল টানাপোড়েন, বিস্ময়বিমূঢ় হতভম্ব দশা আর তা থেকে শেষ অব্দি তিনি যে চূড়ান্ত তাত্ত্বিক ভূমিতে গিয়ে পৌঁছোন—সব ফুটে ওঠে এক জীবন্ত স্পর্শময়তায়, তার সমস্ত অস্ফুট সূক্ষ্ম অন্তর্লীন গুঞ্জন আর তাৎপর্য সমেত।

বর্ণনা, বিবরণ, চরিত্রচিত্রণ—সবদিকেই শরচ্চন্দ্রের এই অসাধারণ উপন্যাস রুদ্ধশ্বাসে পড়বার মতো। রাজনীতি নিয়ে কোনো কারণে রোমাঞ্চকর উপন্যাস নয় এটা, নয় আন্দ্রে মালরোর 'মানবনিয়তি' বা দস্তয়েভস্কির 'শয়তান'-এর মতো স্নায়ুতাড়িত ব্যাধিপীড়িত উপাখ্যান। সন্ত্রাসবাদ আর উৎপীড়ন বিষয় হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক অমরদাসের মতো কোনো নিরীহ চরিত্রকে কেন্দ্রব্যক্তি হিসেবে বেছে নেবার জন্যেই হয়তো এই উপন্যাস আমাদের কাছে যথার্থ সত্য বিবরণ হিসেবে পৌঁছোয়। আমাদের পাঠকদের আরো পছন্দ হবে এই বই, কেননা বিষয় আর চরিত্রেরা পাঠকের চেনা। আমরা এরকম অনেক কাহিনীর সঙ্গে জীবন থেকেই পরিচিত। এখানে অতিরিক্ত যা আছে তা শরচ্চন্দ্রের অপরিসীম স্নেহ আর মমতার বোধ।

কেন যে বন্দরনায়কে অপস্তৃত হবেন, কেন যে দশ বছর ধরে তামিল ও সিনহলিদের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন ও লালন করা হবে, কেন তারপর আশির দশক জুড়ে এই বিরোধ রক্ত আগুন মৃত্যু ছিটিয়ে দেবে, তারও ইঙ্গিত আছে এই বইতে। শ্রেণীসংঘাত থেকে কেন চোখ সরিয়ে আনা দরকার জাতিবৈষম্যে, কেন তাদের একজোট হবার সুযোগ দেয়া হবে না, তাও বুঝতে অসুবিধে হবে না, যদি এই উপন্যাস আর তার জুড়ি শ্রীলঙ্কার গল্পসংকলনটি মন দিয়ে পড়া যায়। আর এ তো আমাদের চেনা বিষয়: কেমন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের লালন করে কেউ, গড়ে তোলে হিন্দুমুসলমান-বিরোধ, হিন্দুশিখ-বিরোধ, হরিজন-বর্ণহিন্দুবিরোধ, অসমীয়া-বাঙালি-বিরোধ, সেটা মনে রাখলে তামিল-সিনহলি বিরোধের বীজ কোথায় বুঝতে তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। গুণেরত্নের গল্প-সংকলনে গল্পের পর গল্পে ফুটে উঠবে কেমন করে সে-দেশে বাঁচে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মেয়ে, দাসী, কেমন করে বড়ো হয় ছোটোরা, কোথায় বেঁচে থাকে সংস্কার কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস, কেমন করে হানাদার ভূতের সঙ্গে অতীতকে নিয়ে ঝিম ধরে বেঁচে থাকে মুহমান দেশ—১৯৭১-এর সেই স্বল্পস্থায়ী ছাত্র-অভ্যুত্থান কাঁপিয়ে দিয়েছিল শাসকদের; তাদের মনে হয়েছিল এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শ্রেণীগতভাবে এদের দুর্বল করে না-দিলে চলবে না। আর অন্তত এই প্রাসঙ্গিক ঔৎসুক্যের জন্যেও বই দুটিকে জরুরি মনে হবে পাঠকের—উৎকৃষ্ট কিছু গল্প আর স্পর্শময় একটি উপন্যাস অভিজ্ঞতা ও উত্তেজনাটা কাউ—তবে অতীব মূল্যবান অতিরিক্ত লাভ। আর হয়তো এটাও এক লাভজনক অভিজ্ঞতাই যে তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের মধ্যে মিলগুলো নেহাতই বানানো মনগড়া অলীক কোনো বিষয় নয়।

# রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী

"জানেন, গুরুদেব বলেছিলেন আমায় যে, যদি কোনো দিন তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি কেউ করে, তবে তা যেন সাদা মেটিরিয়ালে তৈরি হয়। গুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ হল—এ বছর তাঁর জন্মজয়ন্তীতে চন্দননগরে রবীন্দ্রভবনে বসল আমার তৈরি তাঁর শ্বেতপাথরের মূর্তি।"—খুশিতে উচ্ছল হয়ে জানালেন কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী তথা ভাস্কর শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাল।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি ওঁকে: 'তাই নাকি? রবীন্দ্রনাথের সাথে কিভাবে দেখা হল আপনার? আর কিছু কথাবার্তা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?'

"সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন ১৯৪০। কিছুদিন বিশ্রাম নেবার জন্যে গুরুদেব তখন মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে। ভারি ইচ্ছা ছিল গুরুদেবের একটা মূর্তি করি। ভাবলাম নিভৃতে গুরুদেবকে পাবার এই সুযোগ হয়তো আর নাও আসতে পারে। কাউকে কিছু না বলে সোজা রওনা দিলাম মংপুতে।"

"মংপুতে পৌছে গুরুদেবের সাথে দেখা করতে গেছি। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে আসছি। উত্তরে বললাম, কৃষ্ণনগর থেকে। বললাম, আমার আসার উদ্দেশ্য তাঁর একটি মডেল তৈরি করা। সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যদুনাথ পালকে চেন?' আমি বললাম: 'তিনি তো আমার দাদু, আমার বাবার মামা।'

'উৎফুল্ল হয়ে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন: 'তাই নাকি? আরে, তিনি তো আমার বন্ধু।'

"এবারে আমার আরজি: যদি দশ-পনেরো মিনিট সময় দেন তো আপনার একটা মডেল তৈরি করি।"

একটু ইতস্তত করে গুরুদেব বললেন: 'এত অল্প সময়ে তা কী করে সম্ভব বলো? তা ছাড়া তোমাকে এখানে থাকতেই বা কী করে দিই? ঐ ছাখো, যাঁর কাছে রয়েছি তাঁর শ্বাশুড়ি আসবেন, তাই ঘর তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা দেখি, আট দিন পরে যখন আমি কালিমপঙে যাব তখন যদি হয়।'

"সাহস করে আমি তাঁকে আমার তৈরি গান্ধিজীর মডেলের ছবি আর রামগড় কংগ্রেস প্যানডেলের যে সাজসজ্জা করেছিলাম, তার ছবিও দেখালাম। দুয়েরই ছবি দেখে গুরুদেব তো বেন উনি শেষ পর্যন্ত রাজি হবেন না। আপনি বরং কৃষ্ণনগরেই ফিরে যান।' মনটা একটু দমে গেল। তবু কালিমপঙ যাব ঠিক করে যখন হ্যাঙ্গিং ব্রিজ-এর কাছে গিয়ে পৌছেছি, শুনলাম উপরে যাবার গাড়ি পাওয়া খুব শক্ত। হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, যে-কোনো গাড়িতে যদি একটাও খালি সীট পেয়ে যাই তাহলে নিশ্চয়ই আমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। এইসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি একটি গাড়ি যাচ্ছে—জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাতে একটাই সীট খালি আছে। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়লাম।

"নির্দিষ্ট দিনে গুরুদেব কালিমপঙে এলেন। আমিও হাল ছাড়ি নি। ইতিমধ্যে 'মডার্ন রিভিউ'-তে দীনবন্ধু এন্‌ড্রুজের একটি ছবি বেরিয়েছিল—সেই ছবি অনুসরণ করেই তৈরি করে ফেললাম তাঁর একটা মডেল। দীনবন্ধু সাহেব তখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন—তাই গুরুদেবকে উপহার দেবার জন্যই তৈরি করেছিলাম মডেলটা। যাই হোক, অনিলবাবু (অনিলকুমার চন্দ) মডেল-সমেত আমাকে নিয়ে গেলেন একদিন গুরুদেবের কাছে। গুরুদেবকে মডেলটা দিতেই তিনি তো প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। বললেন: 'বাঃ! এ তো অসাধারণ হয়েছে!' তারপরেই তাঁর বিস্মিত জিজ্ঞাসা: 'তা এত সুন্দর মডেলটা তুমি আমায় দিলে কেন? এটা বিক্রি করলে তো অনেক টাকা পেতে?' আমি সে প্রশ্নের ধার দিয়েও না গিয়ে আমার মূল ইচ্ছাটা এবার তাঁর কাছে

## প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

খুব খুশি। কিছুক্ষণ পর আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি এখনও মানুষের ছোট-ছোট মূর্তি তৈরি কর? বললাম, 'হ্যাঁ।' উত্তর শুনে মনে হল তিনি বেশ খুশি হয়েছেন।"

"গুরুদেবের ঘর থেকে বেরোতে যাব, এমন সময় উনি সুধাবাবুকে ডেকে বললেন, 'এই সুধা, একে এমনি পাঠাস না যেন, ভালো করে খাইয়ে পাঠা।' পাশের ঘরে গিয়ে বসেছি। সুধাবাবু এক-ট্রে খাবার নিয়ে এলেন। খাচ্ছি, এমন সময় সুধাবাবু বললেন, 'আপনি কালিমপঙ যাবেন ভাবছেন, কিন্তু গুরুদেব বললে কী হবে? দেখ-







ব্যক্ত করলাম: তাঁর একটা মডেল তৈরি করতে চাই। এবার গুরুদেব আর আপত্তি করলেন না। দিনক্ষণ ঠিক হল। কাঠকুটো, মাটি ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলুম নির্দিষ্ট দিনে। গুরুদেবও প্রস্তুত। কাজ শুরু করে দিলাম। সবে আধঘণ্টা হয়েছে—আমার কাজও শেষের দিকে, রবীন্দ্রনাথ সুধাবাবুকে ডেকে বললেন, 'দেখ, দেখ, কী সুন্দর মডেলটা তৈরি করেছে। যা অনিল, রথী আর বউমাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

"ডাক শুনেই ওঁরা তো সকলেই ছুটে এলেন। গুরুদেব বললেন: 'মনে হচ্ছে ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথ দেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন!' উপস্থিত সকলেই খুব প্রশংসা করলেন আমার কাজের।

"পরের দিন আবার শুরু করলাম আমার কাজ। আপন মনে গুরুদেব বলে চললেন: 'দেখো, বিদেশী ভাস্কররা কখনোই তাঁদের কাজে আমাদের চারিত্র্য ঠিক ফোটাতে পারেন না। একবার হল কী, লনডনের এক ভাস্কর আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্টুডিয়োয়—উদ্দেশ্য আমার মডেল তৈরি করবেন। কী বিরাট স্টুডিয়ো তাঁর। আমাকে তো বসালেন ভারি সুন্দর এক রিভলভিং চেয়ারে, আর বারবার করে নিলেন আমার মাপজোক। কিন্তু যত বারই মডেল তৈরি করে দেখান আমাকে, আমি বলি ও হয় নি, চেনাই যাচ্ছে না আমাকে।'

'আরেক বার আমেরিকায় একজন খুব বড়ো আমেরিকান ভাস্কর নিয়ে গেলেন তাঁর স্টুডিয়োয়। সেখানেও সেই এক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। দেশেও, দু-একজন চেষ্টা করেছিল। তাও ঠিক মনোমতো হল না।' কিছুক্ষণ থেমে গুরুদেব বললেন একটি গভীর কথা: 'দেখো, পৃথিবীর প্রায় সবদেশই তো ঘুরলাম, তাঁদের শিল্পকলাও দেখেছি, কিন্তু সব মিলিয়ে আমার কী ধারণা হয়েছে জান? গ্রীক শিল্পই বলো আর ইতালিয়ান শিল্পই বলো—সব শিল্পই উন্নতি করেছে আমাদের যে শিল্পবৈভব, তার থেকে কিছু না কিছু উপাদান সংগ্রহ করেই।"

"কথায় কথায় তিনি তুললেন যদুনাথ পালের কথা। বললেন: 'জান, আমার বাড়ির লোকেরা একবার ইটালি থেকে একটা মডেল আনিয়েছিলেন। সে এমনই মডেল যে তা থেকে বুঝে ওঠা ভার যে, সে কিসের মডেল। যাই হোক, যদুবাবুকে ডেকে যখন তাকে শনাক্ত করার ভার দেওয়া হল, তিনি নিখুঁতভাবে এমন একটি মডেল তৈরি করে দিলেন যে—ঠিক যেমনটি তুমি আজ করে দিলে—মডেলটি কার, তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সত্যি, কী বিরাট প্রতিভা যে তাঁর ছিল। আর সেই থেকে তিনি আমার বন্ধু হয়ে গেলেন।'

"প্রখরশিল্পবোধসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ যদুনাথের প্রতিভাকে ঠিকই চিনেছিলেন। কেননা সত্যিই যদুনাথ তাঁর জীবৎকালেই হয়ে উঠেছিলেন যেন এক কিংবদন্তীর নায়ক,—শুধু ভারতবর্ষে নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল তাঁর সারা জীবন। ভারতসরকারের কৃষি ও রাজস্ব সচিব স্যার এডওয়ার্ড বাক দ্বিধাহীন কণ্ঠে ১৮৯৮ সালে তাই বলেছিলেন: Jadunath was the prince of modellers in the 1880-90 decade.

"আমার কাজ শেষ হলে পরে গুরুদেব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন তাঁর মডেল। খুশিতে দেখলাম তাঁর সারা মুখ উদ্ভাসিত। নিজে থেকেই এবার তাঁর জিজ্ঞাসা: 'আচ্ছা খুব তাড়াতাড়ি এটারই একটা মিনিয়েচার তৈরি করে দিতে পার?' বললাম, পারি। পরের দিনই আবার দেখা দিলাম তাঁকে। কাজও শুরু করলাম। সবে পাঁচ মিনিট হয়েছে সুধাবাবু বলে উঠলেন, 'দেখুন গুরুদেব, পাঁচ মিনিটেই কীরকম লাইকনেস এসে গিয়েছে।'

"সাত মিনিটে মডেলটা শেষ করে তুলে দিলাম তাঁর হাতে। ভালো করে দেখে তিনি বললেন: আগেরটার তুলনায় এটা মনে হচ্ছে আরো সুন্দর। এই ধরনের ছোটো-ছোটো রাফ হাতের কাজে চারিত্র্যকে ঠিকমত প্রকাশ করাই তো সত্যিকারের আর্ট। তা না লোকে কেবল চাইবে স্লেইন, স্লেইন! তা তোমরা কি করবে বলো?'

"আমি এবার তাঁকে বললাম আমার কাজ দেখে তাঁর যা মনে হয়েছে একটু যদি লিখে দেন—কারণ, সে হবে আমার মস্ত বড়ো পাথেয়। গুরুদেব উৎসাহভরে বললেন: 'নিশ্চয়ই।'"

সুধাবাবুর কাছে তাঁর প্যাডটা চেয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই চিঠি যা আজও কার্তিকবাবুর শিল্পী-জীবনের পরম সম্পদ।

"ওই দেখুন"—কার্তিকবাবু অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখান।

বিস্ময় আর আনন্দে মেশামেশি দৃষ্টি নিয়ে দেখি, দেয়ালে একটু উপরের দিকে বাঁধানো ফ্রেমে ধরা রয়েছে সেই অবিস্মরণীয় হস্তাক্ষর—তখনও অখ্যাত মাত্র বাইশ বছর বয়সের এক প্রতিভাধর শিল্পীকে তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি:

'কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র পাল আমার যে মূর্তি গঠন করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার দ্রুত হস্তের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। য়ুরোপে বা আমেরিকায় যে শিল্পীরা আমার মূর্তি গড়িয়াছেন তাঁহারা আমাকে ক্লান্তিতে পীড়িত করিয়াছিলেন। ইঁহার হাতে সে দুঃখ পাই নাই।—ইতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাং ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭, গৌরীপুর ভবন কালিম্পং।'

এদিক থেকে কাতিকবাবুও সেই বিখ্যাত যদুনাথ পালের যোগ্য উত্তরসূরী; কারণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মূর্তি নির্মাণেও ব্যর্থ হয়েছিলেন আর-এক বিদেশী শিল্পী—আর্ট স্কুলের সেই প্রখ্যাত হ্যাভেল সাহেব! তা সার্থকভাবে গড়েছিলেন ওই যদুনাথ পাল এবং সেজন্য হ্যাভেলের অধীনে কাজ করা বেশিদিন তাঁর পোষায় নি। এর কিছুদিন পরেই আর্ট স্কুল থেকে তিনি পদত্যাগ করেন।

"অথচ কী জানেন, দুঃখের ব্যাপার হল এই, দিল্লীর রবীন্দ্রভবনের সামনে গোলপার্কে বসানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের একটা বারো ফুট মূর্তি তৈরির কাজে কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন, কিন্তু কাজটা শেষ পর্যন্ত তাঁরা ফেলে রেখে দিলেন।"

জিজ্ঞাসা করি, তা হল না কেন কাজটা?

"সে অনেক ব্যাপার। আজকের কথা তো নয়। সেই ১৯৫৮। কী হল জানেন? ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ওই মূর্তি বসানোর। সেইমতো আমাকে নিয়ে পাঁচজন শিল্পীকে নমুনা দিতে বলা হয়—তাতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং এ ব্যাপারে নিযুক্ত ক্যাবিনেট সাবকমিটি আমাকেই নির্বাচিত করেন। এবার শুধু একটা ফরমাল ফাইনালাইজেশনের অপেক্ষা—সেজন্য কবির সাহেবের সঙ্গে একদিন আমার অ্যাপয়েনটমেনট ঠিক হল।

"নির্দিষ্ট দিনে গেছি জয়েনট সেক্রেটারি সি ঘোষের কাছে। উনিই নিয়ে যাবেন কবিরের কাছে। তিনি তখন এডুকেশন ডিপার্টমেনটে রয়েছেন। মি ঘোষের ঘরের পাশেই তাঁর ঘর। কথা বলছি মি. ঘোষের সঙ্গে। হঠাৎ দেখি উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করে এক ভদ্রমহিলা ঘরে সন্দেহজনকভাবে উঁকি দিয়েই অদৃশ্য।"

নিথর নিস্তব্ধতায় গল্প বেশ জমে উঠেছে। কাতিকবাবু শুরু করলেন, "আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। বুঝলেন?"

'সন্দেহ? কেন?'

"বললে পরে বুঝবেন সবটা। কী হল শুনুন। মি. ঘোষ তো তারপর কবির সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে বললাম, 'প্রাইম মিনিসটার এবং ক্যাবিনেট সাবকমিটি তো আমার নমুনা অ্যাপ্রুভ করেছে; মূর্তিটা পনেরো দিন হল পড়ে আছে প্রাইম মিনিসটারের বাড়িতে। এবার একটা কিছু ফাইনাল করে ফেলেন তো ভালো হয়।'

"সব শুনে কবির বললেন—'তা বেশ তো। মি. ঘোষের সঙ্গে বসে কালকেই ফাইনাল করে নিন।' মি. ঘোষ জানালেন ওঁকে পরের দিন কলকাতা যেতে হবে। তখন কবির সাহেব নেক্সট্ ম্যানকে দেখিয়ে বললেন, 'তাহলে এঁর সঙ্গে বসেই ফাইনাল করে নিন'।"

"পরদিন যখন কবিরের কাছে গেছি তখন কবির যা বললেন তাতে আমি যাকে বলে শকড্—কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সেই মুহূর্তে কাজটি হাতে নিতে চাইছেন না।"

কাতিকবাবু ততক্ষণে বুঝে ফেলেছেন যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো একটা গোলমাল রয়েছে, আগের দিনের ভদ্রমহিলার সেই সন্দেহজনক ঘোরাফেরাও একবার মনে উঁকি দিয়ে গেল।

"একটু ইতস্তত করে কবির বললেন, 'মিঃ পাল, আপনি বরং এটা ছেড়েই দিন।'

কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিল্পী রুখে উঠলেন: "কাজটা প্রাইম মিনিসটার আর ক্যাবিনেট সাবকমিটির অ্যাপ্রুভাল পেয়েছে। আমি বাঙালির ছেলে, ছাড়ব না।"

বললেন? মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করি ওঁকে। যে পৌরুষের দৃষ্টান্ত আজ লুপ্তপ্রায়, তারই একটা সুরভিত আলো যেন ছড়িয়ে পড়েছে ওঁর সাদা মুখে চোখে।

উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বলে দিলাম। কেন মেনে নেব বলুন তো এই অন্যায়?"

কবির তারপর কিছু বললেন?

"কবির ততক্ষণে নরম হয়ে গেছেন। তবে বুঝলাম ব্যাপারটাতে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। বরং তাঁর ইচ্ছাই ছিল, কারণ তিনি বললেন, 'আপনি আবার একটা নমুনা করবেন? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে রেখে কয়েকজন জাজকে দিয়ে দেখিয়ে ওখান দিয়ে বার করিয়ে নেব'।"

অগত্যা কাতিকবাবু রাজি হলেন। এবার ওই নমুনা তো ছিলই, তার সঙ্গে ডাবল দি লাইফ্ সাইজ হেড মডেল-ও একটা তৈরি করে পাঠালেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।

এর পরের কাহিনী আরও চমকপ্রদ।

জাজ হিসেবে আসার কথা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, অনিলকুমার চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ কর আর হুমায়ুন কবির স্বয়ং। কবির অবশ্য আসতে পারলেন না। অগত্যা চারজনকেই জাজ ঠিক করা হল। কিন্তু সেখানে ফের বিপর্যয়। কেন?

কাতিকবাবুর উত্তর: "আর বলেন কেন? সেখানেও দেখি ওই সেই ভদ্রমহিলা—নাম তাঁর জানলাম সারদা রাও, এডুকেশন অ্যাডভাইসার। দেখি ফাইল হাতে তিনি জাজদের সাথে ঘুরছেন। প্রতিমা দেবী, অনিলকুমার চন্দ আর সুরেন্দ্রনাথ কর তখন নমুনা দেখছেন আর সারদা রাও কায়দা করে সৌম্যেন্দ্রনাথকে আটকে রাখলেন কী সব কথাবার্তায়। ফলে তাঁর আর নমুনা দেখা হল না। মনে মনে ছটফট করছি, কিন্তু ভদ্রতাবশত কিছু বলেও উঠতে পারছি না। ইতিমধ্যে আমি লক্ষ করেছি তিনজন জাজের প্রতিক্রিয়া। প্রতিমা দেবী তো প্রথমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'বাঃ, এত সুন্দর মূর্তি!' অন্য দুজনও খুব খুশি আমার কাজ দেখে।

"তারপর জাজদের বিদেয় করে একতলা থেকে উপরে উঠে এসে সারদা রাও আমায় বললেন: 'মিঃ পাল, ডিফারেন্ট জাজেস হ্যাভ ডিফারেনট ওপিনিয়নস, ইউ শুড সাবমিট ইওর বিল—'

ওঁকে থামতে দেন নি কাতিকবাবু; ওঁর মুখের উপর সাফ জবাব দিয়েছিলেন, 'সারটেন্লি নট্! আই হ্যাভ গট্ ভেরি হাই ওপিনিয়ন ফ্রম দোজ থ্রি জাজেস্। ইউ ডিড্ন্ট লেট সৌম্যেন টেগোর সী দ্য স্যাম্পল।'

বিল কাতিকবাবু জমা দেন নি। দেওয়া তো খুব সংগত কারণেই অসম্ভব ছিল।

অথচ ঐ স্যাম্পেল যে সত্যিই শিল্পীর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি তার আরও অনেক প্রমাণ ছড়িয়ে আছে উপরিলিখিত প্রমাণগুলি ছাড়াও। প্রথমেই দেখা যাক ললিতকলা অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেনট মেহদি নওয়াজ জং ১৯৬৩ সালের ২৩-শে এপ্রিল তাঁর অফিসিয়াল চিঠিতে এই স্যাম্পেল সম্পর্কে কী বলছেন:

"আই ওয়জ গ্রেটলি ইমপ্রেসড ব্য সী দ্য ফোটোগ্রাফ অব দ্য ফুলফিগার মডেল অব গুরুদেব অ্যানড হাউ সাকসেসফুলি ইউ হ্যাভ ব্রট আউট দ্য লাইকনেস অব দ্য ফিগার উইথ দ্য এক্সপ্রেশন অ্যাণ্ড চারমিং অ্যাট্রাকশন অব গুরুদেব ফ্রম হেড টু ফুট। ইউ হ্যাভ মাই কনগ্রাচুলেশনস ফর দ্য গুড জব ডান।"

আর এ সম্পর্কে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর স্বীকৃতি? সেও কি ভোলবার? —"আই অ্যাম ভেরি মাচ ইম্প্রেসড অ্যাণ্ড প্লিসড টু সী দ্য পিস অব মডেল অব গুরুদেব শ্রী রবীন্দ্রনাথ টেগোর। (তাং, ১১-৩-৬১)।"

তা ছাড়া সবরকম কালিমার ঊর্ধ্বে আসীন, শুভ্র সৌকুমার্যে উজ্জ্বল তদানীন্তন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তো আছেনই। তিনিও দেখি ১৯৭১ সালে ২৭শে মের চিঠিতে উচ্ছ্বাসভরে ওই মূর্তি বসানো সম্পর্কে কাতিকবাবুকে লিখছেন: "দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন অ্যাবাউট দ্য ফাইন কোয়ালিটি অব ইয়োর ওয়র্ক অ্যানড দ্য স্ট্যাচুজ অব দ্য এমিনেন্ট পারসোনালিটিস্ হুইচ ইউ হ্যাভ মেড এ্যাণ্ড্ টু দ্য আর্টিষ্টিক্ গ্লোরি অব বেঙ্গল। ইট উড বি এ গ্রেট থিঙ ইফ উই কুড হ্যাভ এ স্ট্যাচু অব রবীন্দ্রনাথ আইদার ইন মার্বেল অর ইন ব্রোনজ ইনস্টলড ইন দ্য রবীন্দ্রভবন।"

তাই এত ব্যাপারের পরও কাতিকবাবু ছেড়ে দেন নি। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কাতিকবাবু যোগাযোগ করলেন। ঠিক হল তিনি চাকদার ইলেকশন ক্যামপে স্যাম্পল দেখবেন। নির্দিষ্ট দিনে মূর্তি দেখালেন কাতিকবাবু। সৌম্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'এত সুন্দর মূর্তি। কেন আপনি সেদিন দেখান নি?' সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা বলায় তিনি বললেন: 'আপনি এক কাজ করুন। মহাবোধি সোসাইটিতে এগজিবিট করুন, আমি আটজন জাজকে দিয়ে দেখাব। তারপর তাঁদের মতামত টেলিগ্রাম করে দিল্লিতে পাঠাব।'

'ঠিক হল সব? আটজন বিচারক কে কে ছিলেন?'

"সবার নাম তো মনে নেই। তবে সৌম্যেন্দ্রনাথ তো ছিলেনই, তাছাড়া ছিলেন ও. সি. গাঙ্গুলি, কেদার চাটুজ্জে, সুকোমলকান্তি ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।"

—'তা ওঁরা কী মত দিলেন?'

—"ওঁদের সকলেই নমুনা পছন্দ করে টেলিগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন ওঁদের সিদ্ধান্ত। তবে কিছুই কাজ হল না তাতেও। সারদা রাও ফাইলে রাখলেন না সেই টেলিগ্রাম।"

'কী করে বুঝলেন?'

"প্রথমে বুঝলাম ত্রিগুণাবাবুর

মারফত। তাঁর সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ওঁকে বলেছিলাম ব্যাপারটা দেখতে। উনিই আমায় জানিয়েছিলেন যে টেলিগ্রাম ফাইলে নেই। তা ছাড়া পরে সারদা বাগুকে টেলিফোন করে আমিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম টেলিগ্রামের কথা। উনিও জবাব দিয়েছিলেন: 'ইট ইজ মিসিং'।"

'তারপর আর চেষ্টা করেছিলেন?'

"করেছিলাম। ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রাইম মিনিস্টার এবং কংগ্রেসের সভাপতি, চিঠি দিয়েছিলাম এই প্রস্তাব দিয়ে এবং সমস্ত ইতিহাস জানিয়ে। সে চিঠির সরাসরি কোনো উত্তর আসে নি, তবে সে চিঠি সি. পি. ডব্লু. ডি' ফরওয়ার্ডেড হয় এবং-উত্তর আসে 'ফানডস ডু নট পারমিট'। আর একবার চেষ্টা করেছিলাম যখন মোরারজী প্রাইম মিনিস্টার, তবে সেটা অন্যভাবে।"

'অন্যভাবে মানে?'

"মোরারজী যখন প্রাইম মিনিস্টার তখন আমি নিজেই ওঁকে চিঠি লিখে জানাই যে, আমি গুরুদেবের বারো ফুট একটা প্লাসটারের মূর্তি তৈরি করেছি। সেটা দিয়ে দিল্লী থেকে যদি একটা ব্রোনজ বা পাথরের মূর্তি তৈরি করে দিল্লীতে বসানো হয় তো খুব ভালো হয়।"

'উত্তর এল?'

"এল। তখনকার এডুকেশন অ্যাডভাইসার ওই মূর্তির তিনটে অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি আর রবীন্দ্রনাথের চিঠির ফটোস্ট্যাট কপি পাঠাতে লিখলেন। সব কিছু নিয়ে চলে গেলাম দিল্লী। ওখানে গিয়ে মোরারজীর সঙ্গে অ্যাপয়েনটমেনট নিলাম।"

এরপরের কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কারণ এই সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হ'ল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মোরারজীর এক অভাবনীয় মন্তব্য।

"কী হল জানেন? ৮ই মে, বাঙলায় ২৫শে বৈশাখ সেদিন। সকাল সোয়া সাতটায় মোরারজীর ঘরে ঢুকেছি। স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন মোরারজী: 'আইয়ে আইয়ে, বৈঠিয়ে।' দু-একটা কথার পর সব বললাম। তাতে মোরারজী কী বললেন জানেন?"

'কী বললেন?—আমার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

"ওঁর ঘরের দেয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ আর মহাত্মাজীর ছবি দেখিয়ে বললেন: 'দেখিয়ে, ইয়ে কৃষ্ণজী হ্যায়, ইয়ে মহাত্মাজী হ্যায়, ইয়ে রামকৃষ্ণজী হ্যায়। ইয়ে তিনোকো হাম পহন্তা, ইসসে জাদা হাম কোয়িকো নেই জানতা। আওর আপকো উয়ো নেতাকো মূর্তি বনাকে সেনট্রাল গর্ভমেণ্ট সে দিল্লী মে রাখ্যা যায় তো সমুচা প্রভিনস সে কহেগা হমারা ইন্‌কো রাখো, হমারা উন্‌কো রাখো—তো দিল্লী পুত্‌লা কা রাজ হো যায়গা।'"

—'এত বড়ো কথা বললেন মোরারজী? আমার বিস্ময়াহত প্রশ্ন।

"বিশ্বাস করুন, একটা কথা বাড়িয়ে বলছি না, প্রতিটি কথা আজও জলজল করছে আমার মনে—ভুলতে পারি নি কিছুতে। যদি আপনার লেখায় কেউ সন্দেহ করে তো বলুন আমি সই করে দিচ্ছি!"

সত্যিই কী অজ্ঞতা আর সংকীর্ণতা! যাঁর মূর্তি গড়ার কথা হচ্ছে সেই রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াতে চেয়েছিলেন চিরটাকাল 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে', আজীবন খুঁজেছিলেন শুধু 'মানুষের ধর্ম', আর যিনি মূর্তি গড়বেন তাঁরও জীবন তো সেই শিক্ষায় ভতপ্রোত—তাই স্বয়ং মহাত্মাজী থেকে শুরু করে সারা ভারতের কত মহৎ ব্যক্তিত্বকেই না তিনি মূর্তিমন্ত করলেন তাঁর হাতের কাজে।

"মনে রাখবেন তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মুখে এই ধরনের কুরুচিপূর্ব উক্তি! তবে আমিও ছেড়ে দিই নি, বুঝলেন। মুখের উপর বললাম; 'আপ কেয়া কহা রহা হ্যায়! গুরুফাদার অব গুরু নেশন কলড হিম গুরুদেব অব গুরু নেশন!' উন্‌কা মূর্তি বনাকে সেনট্রাল গভর্মেণ্ট সে দিল্লীমে রাখ্যা যায় তো বহুত আচ্ছা হোয়। আজ এইটর্‌ মে হ্যায়, আজই ডিসিশন লে লিয়া তো বহুত আচ্ছা হোয়।"

কিন্তু মোরারজীর জেদ তো আমরা সকলেই জানি—পাহাড়ের অনড়তাকেও হার মানায়। তাই সেই এক কথায় পুনরাবৃত্তি: 'ইস্‌সে জাদা হাম কোয়ি কো নেই জানতা।'

কাতিকবাবুর তখন আপাদমস্তক জলে উঠেছে। নিজেকে অতি কষ্টে সামলে শুধু 'ও: হো, নমস্তে' বলে বেরিয়ে এসেছিলেন।

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। অদম্য মনোবলে—যা তাঁর শিল্পীজীবনের সমস্ত সফলতার চাবিকাঠি—শেষ চেষ্টা করেছিলেন বিজয়সিং নাহারকে দিয়ে। বিজয়বাবু পাঠিয়েছিলেন ওঁকে শ্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের কাছে। কিন্তু সেও সেই আত্মমর্যাদাহীন আত্মগত্যের ইতিহাস। প্রতাপ







চন্দ্রের শুকনো উত্তর: 'রবীন্দ্রনাথের মূর্তি করতে পারব না।' কাতিকবাবুর পাল্টা প্রশ্ন: 'সে কী আপনি বাঙালি? এডুকেশন মিনিস্টার? আপনি পারবেন না?' এবার নরম হয়ে প্রতাপচন্দ্র জ্ঞাপন করলেন তাঁর অসহায়তা: 'কোনো উপায় নেই, ওই দেখুন, শুধু বাটিকের ছবি করিয়ে রেখে দিয়েছি। তবে—'

—'তবে?' কার্তিকবাবুর শেষ আশাভরা প্রশ্ন।

—'আমাকে যদি কেউ প্রেজেণ্ট করেন, তবে বসাতে পারি।

—'এত দাম দিয়ে তৈরি করে কে আপনাকে প্রেজেণ্ট করবে?'

—'কেউ যদি ফানড রেজ করে করতে পারে। বিজয়দাকে বলুন না, যদি এরকম একটা ফানড করা যায়?'

—'বাঃ! বিজয়দা তো আপনার কাছেই পাঠালেন, আর আপনি আবার ওঁর কাছে পাঠাচ্ছেন!

যাই হোক, কার্তিকবাবু বিজয়বাবুর কাছে গিয়ে বললেনও সব কথা। বিজয়বাবু পার্লামেণ্টারি সেশনে কিছু করার প্রস্তাব দিলেন। তবে ওই পর্যন্তই। এর বেশি আর এগোয় নি।

ভুল হল বোধ হয়। এগোয় নি বলা বোধহয় ঠিক নয়। কারণ যাতে এগোতে পারে সেজন্য নিজের দিক থেকে কাতিকবাবু আজও সচেষ্ট। আজও তিনি আশায় বুক বেঁধে রয়েছেন। একটাই দুঃখ তাঁর যে, এত বড় কাজটা সরকার সেই ১৯৫৮ থেকে ফেলে রেখে দিলেন।

ষাটটি বছর পেরিয়ে গেছে যে বৃদ্ধের জীবনে, তাঁর চোখে আজ তারুণ্যের দীপ্তি দেখে মাথা নত হয়ে যায় আমার। গুরুদেব তাহলে ঠিক মানুষটিকেই দেখতে পেয়েছিলেন। শিল্প যদি হয় জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের এক বিরামহীন সংগ্রাম,—সে সংগ্রাম থেকে উঠে আসে বিচিত্র রূপের নির্ঝর, —তা হলে আজকের অন্ধকার পৃথিবীতে কাতিকবাবুর জীবনও এক শিল্প—সেই অমোঘ ভাস্কর্যেরই ভাস্বর প্রতিরূপ যা তিনি অসংখ্য মূর্তির রূপে সারাজীবন ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন॥

(শ্রীকার্তিক পালের সঙ্গে কথাবার্তার নোট নিতে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অদিতি ভট্টাচার্য)

সুপ্রিয় ভট্টাচার্য

# বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

সৈয়দ আবুল মকসুদ

কোনো জাতির রুচির ও মেধার পরিমাপ করা যায় তার শিল্পকর্ম থেকে, চলচ্চিত্র সর্বাধুনিক শিল্পমাধ্যম ব'লে সেটা থেকে জাতিবিশেষের সর্বশেষ চিত্র পাওয়া সম্ভব। নিতান্ত নির্বোধ, অসংস্কৃত এবং কায়েমী স্বার্থবাদী কেউ ছাড়া আজ সকলেই সকল দিক থেকে সমস্বরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের অধঃপতনের কথা উচ্চারণ করছেন। শিল্পকলার সকল মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্র আজ সর্বাধিক জনপ্রিয় মাধ্যম : প্রযুক্তিনির্ভর ব'লে এর বয়সও কম। সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি এবং বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু ক'রে খেটেখাওয়া দিনমজুর পর্যন্ত সকলেরই কমবেশি সিনেমার সঙ্গে পরিচয় রয়েছে। বিশেষ ক'রে এই টেলিভিশনের যুগে সিনেমা দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে যাবারও প্রয়োজন পড়ে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোয়—১৯৭২-উত্তর সময়ে—বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের যে অধঃপতন হয়েছে তা যে-কোনো সচেতন নাগরিকের বেদনার কারণ, এ নিয়ে এখানে লেখালেখিরও অন্ত নেই ; কিন্তু এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিপুল অধিকাংশের ও-সব কথায় কান দেবার ফুরসত নেই : যে যা-ই বলুক তাঁরা তাঁদের মতো কাজ ক'রে চলেছেন।

শিল্পসংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে অনগ্রসর একটি সমাজে রুচিশীল দর্শকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হওয়াই স্বাভাবিক। সে-কারণে ভালো ছবির অনেক সময় ব্যবসা-সাফল্য কম। বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ এই শিল্পমাধ্যমটির নির্মাতা-প্রযোজক প্রমুখের কাছে, যে-দেশে মানুষ দ্রুত বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বসে আছে, উঁচু মানের ছবি ক'রে তুলনামূলকভাবে কম লাভ করা বা অধিক লোকসান দেবার ঝুঁকি নেয়া কঠিন বৈকি! উন্নত মানের রুচিশীল ছবি করার পরিকল্পনা যে-সব পরিচালকের রয়েছে তাঁরাও আর্থিক লাভ-লোকসানের কথা ভাবেন না তা নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শুধু টাকা লোটার জন্য কুরুচিপূর্ণ ছবি ক'রে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে আরো বাড়িয়ে দেবে। ছায়াছবির বিপুল অধিকাংশ দর্শক সাধারণ মানুষ ও তরুণ ব'লে তাদের স্থূল রুচির প্রয়োজন মেটাবার প্রতিযোগিতায় নামতে হবে? এ জন্যে ছবিতে নায়ক-নায়িকার কুৎসিত নাচানাচি, মারামারি, খুনখারাবি, অর্থহীন লাফালাফি-হুড়োহুড়ি (আমাদের ছবি নির্মাতাদের পরিভাষায় ফাইটিং) এবং যৌন আবেদনময় ক্রিয়াকলাপ দেখাতে হবে তা কোনো কথা নয়। শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষের বৈচিত্র্যহীন জীবনে এ-সব 'আনন্দের' উপাদান হিসেবে ব্যবহার ক'রে একশ্রেণীর চিত্র-প্রযোজক বিপুল অর্থ কামিয়ে নিচ্ছেন। এদিকে সমাজ গোল্লায় যাচ্ছে কি হচ্ছে সে-হিসেব খতানোর সময় নেই তাদের, তাঁরা মহানগরীর অভিজাত এলাকায় নিজেদের বসবাসের জন্য অট্টালিকা তুলছেন, ব্যাংকক-সিঙ্গাপুর-বোম্বে-লণ্ডন-প্যারিস টোকিও-নিউইয়র্ক ক'রে জীবন আক্ষরিক অর্থেই যাপন করছেন : সর্বোপরি তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছেন। এ-সব প্রাপ্তিযোগের পর তাঁদের কেউ নিন্দা করলো কি প্রশংসা করলো তাতে তাঁদের কিছুই আসে যায় না। তাঁরা সুখে আছেন। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা দেশের সর্বাধিক মেধাবী ও গুণী মানুষের চেয়ে কম নয়। তাঁরা রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্থাৎ পদক পুরস্কার ইত্যাদি অবলীলায় পকেটস্থ করছেন। সুতরাং তাঁদের প্রতিহত করার সাধ্য কার?

## বাংলাদেশ থেকে

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কথা বলতে গেলে এখানকার ছবি তৈরির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তও বর্ণনা করতে হয়। ১৯৪৭-পূর্ব কালে বাংলা চলচ্চিত্রের কেন্দ্র-বিন্দু ছিলো কলকাতা। কলকাতায় তৈরি ছবিই ঢাকার সেকালের দু'একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হতো। '৪৭-পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্তও কলকাতায় নির্মিত ছবিই এখানকার দর্শকদের পিপাসা নিবারণ করেছে। শুধুমাত্র তথ্যগত কারণে বিভাগ-পূর্ব-কালের দুটি ছবির নাম আজ উচ্চারিত করতেই হয়—সুকুমারী (১৯২৯) এবং দ্য লাস্ট কিস (১৯৩১)। ঢাকার নবাব পরিবারের কারো কারো পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রচেষ্টায় ছবি দুটি তৈরি হয়েছিলো। সুকুমারী ছিলো একেবারেই ছোটো। আমার সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সাত বছরে নির্মিত হয় 'তনটি প্রামাণ্য ছবি—পূর্ব পাকিস্তানে দশ দিন (১৯৪৮), সালামত (১৯৫৩) এবং আপ্যায়ন (১৯৫৪)। এগুলো ছিলো সরকারী প্রচারধর্মী ছবি। ঢাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ছবি নির্মাণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবদান যাঁর তিনি নজির আহমদ, তিনিই 'সালামত'-এর পরিচালক এবং এই প্রচারধর্মী ছবিই বাণিজ্যিক ছবির পথ নির্মাণ করে দেয়।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গেও ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের কথা না উঠে পারে না : ভাষা-আন্দোলনের প্রভাব আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক চৈতন্যে এমন নাড়া দেয় যে আমাদের সংস্কৃতিসেবীরা বাঙালির আত্মপরিচয় তুলে ধরার জন্যে বিভিন্ন দিকে আত্মনিয়োগ করেন। সেই উদ্যোগে যোগ দেন কিছু চলচ্চিত্র-প্রেমিক। বিশেষ করে 'সালামত' নির্মাণের পর এবং সরকারী উদ্যোগে ক্যামেরা ইত্যাদি কিছু যন্ত্রপাতি জোগাড় হবার পর ফিচার ছবি নির্মাণের কথা অনেকের মাথায় এসে থাকবে। পরিণামে আবদুল জব্বার খানের পরিচালনায় তৈরি হয় 'মুখ ও মুখোশ' : বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক মাইলপ্রস্তর। 'মুখ ও মুখোশ' ১৯৫৫ সালের আগস্টে প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় এবং তা ঢাকার ছায়াছবির জগৎ সম্প্রসারিত করার দরোজা সম্পূর্ণরূপে খুলে দেয়।

১৯৫৯ সালে ঢাকায় চারটি উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি হয় : এ. জে. কায়দার-এর উর্দু ছবি 'জাগো হুয়া সাবেরা', মহিউদ্দিনের 'মাটির পাহাড়', ফতেহ লোহানীর 'আকাশ আর মাটি', এবং এহতেশামের 'এ দেশ তোমার আমার'। চারটি ছবিই কমবেশি দর্শকের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। 'জাগো হুয়া সাবেরা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কাহিনী অবলম্বনে তৈরি, এতে নদীপ্রধান পূর্ব-বাংলার শ্রমজীবী মানুষের জীবন চিত্রিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কায়দার বাঙালি বা বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন না, তিনি ছবি করার জন্যে ঢাকা এসেছিলেন। 'জাগো হুয়া সাবেরা' এগারটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়, তারমধ্যে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা অন্যতম। তা ছাড়া 'মাটির পাহাড়', 'আকাশ আর মাটি' এবং 'এ দেশ তোমার আমার' ছিলো বাংলার মানুষ ও নিসর্গের ছবি—গ্রামবাংলার জীবনভিত্তিক সমাজসচেতন শিল্পকর্ম। ছবিগুলোর নাম থেকেই বুঝা যায় রোম্যান্টিক মেদুরতায় কাব্যিক সুষমা আনবার প্রয়াস নিয়েছিলেন এই পরিচালকগণ। তাঁরা আমাদের প্রথম সচেতন-রোম্যান্টিক শিল্পী।

উল্লিখিত এইসব ছবি তখনই তৈরি হয় যখন ভারতীয় ছায়াছবিতে ঢাকার বাজার জমজমাট। প্রাদেশিক রাজধানীতে তখন থেকেই দ্রুত জনসমাগম হচ্ছিলো—ধীরে ধীরে ঢাকা রূপ নিচ্ছিলো মহানগরীর। সেই সময় ছবিগুলো ঢাকার রুচিশীল ও বিদগ্ধ দর্শককুলকেই যে প্রীত ও মুগ্ধ করেছিলো তাই নয় সাধারণ দর্শকদের কাছ থেকেও পেয়েছিলো আশাব্যঞ্জক সাড়া। ফতেহ লোহানী, মহিউদ্দিন এবং এহতেশাম ছিলেন মননশীল পরিচালক, যদিও তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন রোম্যান্টিক। আজ মধ্য-৮০তে বসে অবাক হই, সেই ৫০-এর বৈচিত্র্যহীন ঢাকার প্রথম ছবি নির্মাতারা যে-রাস্তা বানালেন সেই সড়ক '৭০ সাল পর্যন্ত আসতে না আসতেই কি ভাবে সংকীর্ণ হতে হতে এক অন্ধকার গলির কাছে এসে রুদ্ধ হয়ে গেলো।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শুরু থেকেই ঢাকায় বাংলা ছবির পাশাপাশি উর্দু ছবি তৈরি হয়েছে ; কারণ অখণ্ড পাকিস্তানের বাজারের কথা ভেবেই প্রযোজকরা উর্দু ছবি তৈরিতে উৎসাহ পেয়ে থাকবেন। ৬০-এর দশকে বেশ কয়েকটি ভালো এবং মাঝারি মানের বাংলা ও উর্দু ছবি তৈরি হয় ঢাকায়, এবং তখনই আবির্ভাব ঘটে একদল প্রতিভাবান ও তরুণ চিত্রপরিচালকের। তাছাড়া এই দশকের ছবিতে ছিলো বৈচিত্র্য : সামাজিক, লোককাহিনী ভিত্তিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের ছবি তৈরি হতে থাকে এই সময়ে।

১৯৬০ সালে বলিষ্ঠ অভিনেতা ও পরিচালক ফতেহ লোহানী তৈরি করেন 'আসিয়া' : পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রাঞ্জল দলিল। ছবিটি তৎক্ষণাৎ উচ্চ প্রশংসিত হয়, কিছুটা বাণিজ্যসফলও। 'আসিয়া'র কিছুটা 'পথের পাঁচালী'র প্রভাব ছিলো। ১৯৬১-তে 'আসিয়া' শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করে। ষাটের দশকে যাঁরা অধিক ছবি তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে এহতেশাম, মুস্তাফিজ, সালাহউদ্দিন, সুভাষ দত্ত, খান আতাউর রহমান, জহির রায়হান, নারায়ণ ঘোষ (মিতা), কাজী খালেক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মুস্তাফিজের বাংলা 'হারানো দিন' (১৯৬১) এবং উর্দু 'তালাশ' (১৯৬৩), 'মালা' (১৯৬৫) প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়। এহতেশামের বাংলা 'রাজধানীর বুকে' (১৯৬১), উর্দু 'চান্দা' (১৯৬২) 'চকোরী' (১৯৬৭) প্রভৃতি এই দশকের উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি। ছবিগুলোর ব্যবসাভাগ্য মন্দ ছিলো না।

তবে এই সময় ব্যাপকভাবে ঢাকায় উর্দু ছবি হতে থাকায় এখানকার জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল পরিচালকগণ বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ছবির প্রযোজকরা বৃহত্তর বাজার দখল করার জন্য উর্দু ছবির প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়ে থাকবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ছবি এখানে ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হতো, কিন্তু ঢাকার বাংলা ছবির বাজার সেখানে তেমনটি ছিলো না। এরমধ্যে সালাহউদ্দিন জনপ্রিয় লোককাহিনীভিত্তিক ছবি 'রূপবান' (১৯৬৫) ক'রে এক 'বিপ্লব' সাধন করেন। ছবিটি রাতারাতি দেশের মানুষের মন জয় করে, একাবারে মাসের পর মাস প্রদর্শিত হয়। 'রূপবান'-এর আগেই সালাহউদ্দিনের সামাজিক ছবি 'যে-নদী মরুপথে', 'সূর্যস্নান', 'ধারাপাত' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।

লোকসংস্কৃতি যে বাংলাদেশের মানুষের মনমানসে কি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে তার প্রমাণ 'রূপবান'-এর জনপ্রিয়তা। তবে বাংলাদেশ হুজুগের দেশও। কোনো কিছু নিয়ে একবার মাতামাতি শুরু হলে তা যে-কোনো দুরূহে যেতে পারে। 'রূপবান'-এর সাফল্যে বহু অযোগ্য পরিচালক আরো অসংখ্য লোককাহিনীভিত্তিক দুর্বল ছবি তৈরিতে প্রবৃত্ত হন। সেগুলোরও কোনো কোনোটি বেশ জনপ্রিয় হয়। লোককাহিনীমূলক ছবি উর্দু ছবির বাজার খানিকটা সংকুচিত করতে সমর্থ হলেও সামগ্রিকভাবে এই প্রবণতা বাংলা ছবির ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারে আসে নি।

ঐ সময়ই খান আতাউর রহমান বেছে নেন আরেক নতুন পথ: তিনি ঐতিহাসিক কাহিনী ভিত্তিক 'নবাব সিরাজদ্দৌলা' (১৯৬৭) ক'রে আবার ছবির জগতের মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেন। তিনি অবশ্য আগেই 'অনেক দিনের চেনা' (১৯৬৪) নামে একটি পরিচ্ছন্ন সামাজিক ছবি ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'সিরাজদ্দৌলা'র জনপ্রিয়তার পরে আবার বছর দুই ঐতিহাসিক চরিত্রভিত্তিক ছবি করার প্রবণতা দেখা দেয়। ঠিক সেই সময়ই—ষাটের দশকের শেষার্ধে—দেশে জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার আন্দোলন জোরদার হচ্ছিলো, তাই ঐতিহাসিক ছবি অর্থাৎ নানাধরনের বীরগাথা সংগ্রামশীল মানুষের মন জয় করে।

আলোচ্য দশকের সবচেয়ে দীপ্ত পরিচালক জহীর রায়হান, তাঁর প্রথম ছবি 'কখনো আসে নি' ১৯৬১-তে তৈরি হবার পরই তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ পরিলক্ষিত হয় চলচ্চিত্র জগতে: একজন শক্তিশালী পরিচালকের আবির্ভাব ঘোষিত হয়। পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন এবং শহরে মধ্যবিত্ত সামাজিক বাস্তবতার একজন দক্ষ কারুকার হিশেবে চিহ্নিত হন তিনি। তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছেন ৭২-এ তাঁর নিখোঁজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার শুক্রবা ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর অগ্রজ কথাশিল্পী ও সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিলো। দেশবাসীর ধারণা জহীর রায়হানও তাদেরই শিকার হন। 'কাচের দেয়াল' (১৯৬৪), 'আনোয়ারা' (১৯৬৭)—মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপ, এবং উনসত্তরের গণ-আন্দোলন ভিত্তিক ছবি 'জীবন থেকে নেয়া' তাঁর অসামান্য ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করে। উল্লেখযোগ্য যে, ছায়াছবির বাইরে তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পীও বটে। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ৭১-এ কলকাতায় অবস্থানকালে 'স্টপ জেনোসাইড' নামে তিনি একটি প্রামাণ্য ছবি তৈরি করেন যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম উজ্জ্বল দলিল। তাঁর ছবিগুলোতে সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরার সময়ও তিনি স্থূলতাকে সচেতনভাবে পরিহার করতেন।

৬০-এর দশকের অসংখ্য ছবির মধ্যে সুভাষ দত্তের 'সুতরাং', 'আয়না ও অবশিষ্ট', 'আবির্ভাব', কাজী খালেকের 'মেঘ ভাঙা রোদ', মহিউদ্দিনের 'রাজা এলো শহরে', 'শীত বিকেল' প্রভৃতি; খান আতাউর রহমানের 'অনেক দিনের চেনা', 'জোয়ার ভাটা'; নারায়ণ ঘোষের (মিতা) 'চাওয়া পাওয়া', 'এতটুকু আশা', 'নীল আকাশের নীচে' প্রভৃতি মানের দিক থেকে সমান্তরাল না হলেও বিনোদনমূলক ছবি হিশেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জনপ্রিয় হয় নি কিন্তু চিত্রগুপ্তের প্রশংসা অর্জন করেছিলো সে-সময়ের আরো কয়েকটি ছবি যেমন সাদেক খানের 'নদী ও নারী' (হুমায়ুন কবীরের উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে), রেবেকার 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' প্রভৃতি। এগুলো প্রশংসিত হয়েছিলো, বলা বাহুল্য, এদের শৈল্পিক সূক্ষ্মতা ও সামাজিক বাস্তবতার সার্থক রূপদানের জন্য।

উন্নতমানের ছবির জন্য প্রয়োজন শুধু দক্ষ পরিচালক বা প্রযুক্তির নয় অভিনেতা-অভিনেত্রীরও। এখনো এ দেশে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেনদের মতো নিপুণ চলচ্চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে নি। এ জন্য বাঙালি মুসলমান সমাজের সার্বিক অবস্থাও দায়ী।







তবে ৬০-এর দশকে দেশে এসেছিলো যে-রাজনৈতিক-সামাজিক জাগরণ তার ঢেউ সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কমবেশি স্পর্শ করেছিলো, এই সময় বাঙালি মুসলমান ঘরের মেয়েরা বিপুল সংখ্যায় চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য আত্মনিয়োগ করেন: আজকের অনেক নাম-করা নায়িকা ও অভিনেত্রী এই দশকেই প্রথম অভিনয় শুরু করেন। আরেকটি কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ৬০-এর দশকের পরিচালকদের আদর্শ ছিলেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ ছবি-নির্মাতারা কিন্তু ৬৫-র সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর ঢাকায় ভারতীয় ছবি আসা সেই যে বন্ধ হলো তারপর বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পরও আর পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় নি। এখন ভারতীয় হাইকমিশনের মিলনায়তনে ভারতীয় ছবি এক শ্রেণীর নির্বাচিত দর্শকদের দেখানো হয় বটে তবে সে-সব ছবির অধিকাংশই হিন্দী। অনেকের ধারণা, ভারতীয় ভালো ছবিগুলো এখানে দেখানো হলে বাংলাদেশের ছবির মান উন্নত হবে; পক্ষান্তরে একশ্রেণীর মানুষ মনে করেন ভারতীয় ছবি এখানে এলে ওগানকার ছবির বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য একতরফা ভাবে শুধু ভারতীয় ছবি এখানে আসবে—আমাদের ছবি সেখানে যাবে না, সেটা কোন গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নয়, দুই দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক চুক্তি রয়েছে সেই চুক্তির ভিত্তিতেই দু'দেশের ছবি দু'দেশে প্রদর্শিত হতে পারে।

ভালো ছবির জন্য এ দেশের মানুষের আগ্রহের কমতি নেই। গত ডিসেম্বরে (১৯৮৫) ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)-র শীর্ষ-সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা টেলিভিশন থেকে ভারত-পাকিস্তান নেপাল প্রভৃতি সদস্য দেশের চলচ্চিত্র সম্প্রচারিত হয়। সে-সময় সর্বাধিক সংখ্যক—চারটি—ছবি দেখানো হয় ভারতের এবং চারটিই বাংলা: দীপ জ্বেলে যাই, পথে হলো দেরী, পৃথিবী আমারে চায়, এবং পাশের বাড়ি। বহু বছর আগে তৈরি এই ছবিগুলো সম্প্রচারের সময় টেলিভিশনের সামনে সকল বয়সের দর্শকের সে-কি ভীড়! এ প্রসঙ্গে পাকিস্তান আমলের একটি দৃশ্য মনে পড়ে। 'মহানগর' ঢাকায় এলে তা দেখার জন্য টিকেট-ক্রেতার লাইন হয়েছিলো দুই মাইল দীর্ঘ—রাত থাকতেই অনেকে টিকেট কাউনটারে গিয়ে লাইনে বসে পড়ে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে এ দেশের মানুষ ভালো পরিচ্ছন্ন ছবি দেখতে উৎসুক।

অবশ্য শুধু বাঙালিদের মধ্যেই যে বাংলা ছবির সমাদর সীমাবদ্ধ তা নয়। আজ সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখের নির্মিত ছবি বহির্বিশ্বেও উচ্চ-প্রশংসিত। গত নভেম্বরে আমি বার্লিনের প্রেক্ষাগৃহে মহাসমারোহে সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' প্রদর্শিত হতে দেখেছি। এতে বাংলাদেশের পরিচালকদেরও উৎসাহিত হওয়া উচিত। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমাদেরও দু'একটি ছবি বিদেশে মোটামুটি সম্মান পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-চরাচরব্যাপী অধঃপতন ও অবক্ষয় দেখা দেয় চলচ্চিত্রও তা থেকে বাদ যায় না। তার মধ্যেও কয়েকজ তরুণ প্রতিভাবান ও সচেতন চিত্রপরিচালকের দেখা পাওয়া যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ উপজীব্য অথবা নিজেই নায়ক হয়ে ওঠে বহু ছবির যেমন 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'ওরা ১১ জন', 'সংগ্রাম', 'রক্তাক্ত বাংলা', 'আলোর মিছিল', 'আবার তোরা মানুষ হ', 'বাঘা বাঙালি' প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনা এই জাতীয় ছবির উপজীব্য। এগুলোর সবই যে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছিলো তা নয়, তবু এগুলোর প্রশংসা করতেই হয়—প্রসংশার পাত্র এর পরিচালকরাও যেমন খান আতাউর রহমান, সুভাষ দত্ত, চাষী নজরুল ইসলাম, আলমগীর কবীর, নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবির মধ্যে আগেই জহীর রায়হানের 'স্টপ জেনোসাইড'-এর কথা উল্লেখ করেছি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতার পর এক শ্রেণীর মানুষ বৈষয়িক উন্নতির জন্য এক সোনার হরিণের পেছনে রুদ্ধশ্বাসে ধাবিত হয়, তা থেকে চলচ্চিত্রকাররাও বাদ যান না। যে-কোনো উপায়ে অধিক মুনাফা অর্জনই যেন অনেক ছবি নির্মাতার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে তৈরি হতে থাকে ভূরিভূরি নিকৃষ্টমানের কুরুচিপূর্ণ ছবি। এসব ছবি দেখে কিশোর ও যুবক-সম্প্রদায় আরো বেশি বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, নীতিবিরোধ বিবর্জিত ও আদর্শহীন জীবনের পথে চালিত হতে থাকে। তবুও ৭২-এর পরবর্তী সময়ে যে-কজন পরিচালক অনেকখানি শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যদিও এঁদের সকলের কাজ গুণগত বিচারে সমান্তরাল নয়, খান আতাউর রহমান, আমজাদ হোসেন, সুভাষ দত্ত, আলমগীর কবির, চাষী নজরুল ইসলাম, হাসান ইমাম, কবীর আনোয়ার, মহিউদ্দিন, সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী, বাদল রহমান, মসিহ-

উদ্দিন শাকের, শেখ নিয়ামত আলী, আবদুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। এই সময়ের বেশ কিছু ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সূর্যকন্যা, সুপ্রভাত, মোহনা, সীমানা পেরিয়ে, সারেং বউ, রূপালী সৈকতে, গোলাপী এখন ট্রেনে, সূর্য দীঘল বাড়ী, ঘুড্ডি প্রভৃতি। সূর্য দীঘল বাড়ী এবং সারেং বউ দুটি জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপ। যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের কেউ কেউ এখনো তরুণ, কিন্তু তাঁরা সচেতন শিল্পী, আশা করা যায়, সাধনা ও নিষ্ঠা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে তাঁরা ভালো ছবি তৈরি করতে সক্ষম হবেন।

চলচ্চিত্রে কুরুচির কালো ছায়া নেমে এলেও সমাজের সচেতন একটি শ্রেণী এই আত্মঘাতী প্রবণতার ঘোর সমালোচক এবং এর বিরুদ্ধে সুস্থ চলচ্চিত্র আন্দোলন গড়ে তোলার সপক্ষে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ। ১৯৬৩ সালে এই সংসদ গঠিত হয়, তখন এর নাম ছিলো 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ'। গোড়া থেকেই যাঁরা এই সংসদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আনোয়ারুল হক খান, ওয়াহিদুল হক, মুহম্মদ খসরু, আলমগীর কবির, লায়লা সাবার, ইয়াসিন আমিন, মসিহউদ্দিন শাকের, কাইজার চৌধুরী, মাহবুব জামিল, বাদল রহমান প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সংসদের প্রথম সভাপতি ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। তা ছাড়া বিভিন্ন সময় শিল্পী কামরুল হাসান, কবি শামসুর রাহমান সহ দেশের প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি সেবীদের অনেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে কোনো-না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ দেশে সুস্থ চলচ্চিত্র বিকাশের স্বার্থে নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। বিগত বছরগুলোতে এই প্রতিষ্ঠান শুধু যে বিদেশী সেরা ছবি প্রদর্শনেরই আয়োজন করছে তাই নয় দেশীবিদেশী চলচ্চিত্রের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান, ওয়ার্কশপ, ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স পরিচালনা এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৫-এ এই সংসদ দেশে প্রথম তিন সপ্তাহ ব্যাপী এক ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সের আয়োজন করে এবং সেটি পরিচালনা করেন পুনা ফিল্ম ইন্স্টিটিউটের শ্রী সতীশ বাহাদুর। স্বাধীনতার পরে দেশে আরো বহু চলচ্চিত্র সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ'। বস্তুত, চলচ্চিত্র সংসদের জোর তৎপরতার ফলে ১৯৭৮ সালে সরকার জাতীয় ফিল্ম আরকাইভ প্রতিষ্ঠা করে। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন সংকুচিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে 'চলচ্চিত্র সংসদ নিয়ন্ত্রণ আইন' পাশ হয়। তবু চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন বিকশিতই হচ্ছে। এই আইন বাতিলের দাবিও অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে নির্মলেন্দু গুণের কবিতার থিম অবলম্বনে তানভীর মোকাম্মেল তৈরি করেছেন 'হুলিয়া' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য পরিচ্ছন্ন ছবি।

চলচ্চিত্রের কথা বলতে গেলে সরকারের সেন্সর বোর্ডের নীতিমালার কথাও আসে। সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্র ছাড়া কোনো ছবিই দেশে প্রদর্শিত হতে পারে না। এই বোর্ড যদিও সরকারী বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত তবু তাতে সরকারী মর্জি মেজাজ ও আমলাতন্ত্রের প্রভাবই অধিক। আজ দেশে চলচ্চিত্রের এই অধোগতির জন্য অনেকেই সেন্সর বোর্ডকেই দায়ী করেন, তাদের বক্তব্য বোর্ডের উচিত কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শনের অনুমতি না দেয়া। অবশ্য ১৯৮৪ সালে সেন্সর বোর্ড ঘোষণাও দিয়েছিলো যে 'উদ্ভট, কুরুচিপূর্ণ ও জীবনের সঙ্গে সংগতিবিহীন ছবিকে' ৮৫-র ১লা জানুয়ারি থেকে ছাড়পত্র দেয়া হবে না, কিন্তু ঐ মৌখিক ঘোষণা পর্যন্তই, কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয় নি।

'মুখ ও মুখোস'-এর পর তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ে সংখ্যার দিক থেকে বিপুল পরিমাণ ছবি ঢাকায় তৈরি হয়েছে। সে-সবের পুরো বিবরণ একটি ছোটোখাটো বইতেও দেয়া অসম্ভব। গুণের চেয়ে পরিমাণের দিকটিই এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ছবি তৈরির পরিমাণ আরো বেড়েছে, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দর্শকের সংখ্যাও বেড়েছে। যেমন জানা গেছে, শুধু ৮৫ সালেই ৬১টি ছবি মুক্তি পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে শেখ নিয়ামত আলীর 'দহন' সহ তিন চারটি ছবিই উল্লেখযোগ্য, বাদবাকির বিপুল অধিকাংশ 'নকল' অর্থাৎ বোম্বে ও অন্যান্য জায়গার ছবির নির্লজ্জ অনুকরণ। উল্লেখ্য যে এখানে সাম্প্রতিককালে শরৎচন্দ্র, তারাশংকর প্রমুখ আধুনিক কথাশিল্পীর কাহিনী অবলম্বনেও কিছু কিছু ছবি তৈরি হচ্ছে, যেমন 'চাঁপাডাঙার বউ'।



আজ ঢাকার চলচ্চিত্রের দুর্দশায় বিচলিত, বিব্রত ও লজ্জিত প্রতিটি সচেতন নাগরিক এমন-কি সরকার পর্যন্ত। কিছুদিন আগে এক মন্ত্রী চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থায় গিয়ে বলেছেন, "সৎ ও সুস্থ চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে শীঘ্রই জাতীয় চলচ্চিত্র নীতি প্রণয়ন করা হবে।...চলচ্চিত্র শিল্পে বর্তমানে অস্থিরতা বিরাজ করছে এবং ছবি নির্মাণে জাতীয় স্বার্থের চাইতে ব্যবসায়িক দিকটিই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। অশালীনতা, বিকৃতরুচি, কাল্পনিক ও অবাস্তব ছবি দর্শকের মূল্যবোধে আঘাত হানছে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ছড়াতে উৎসাহিত করছে।" এর চেয়েও ভালো কথা এর আগেও অনেক মন্ত্রী ও সরকারী লোকজন অনেকবার উচ্চারণ করেছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় নি। এখনকার ছবি দর্শকের পুরো দেখার প্রয়োজন নেই, রেডিও-টেলিভিশনে এসবের যে-বিজ্ঞাপন ও টেইলার প্রচারিত হয় তা শুনে বা দেখেই অনেকে কানে আঙুল দেয় এবং চোখ বন্ধ করে। তবে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতিই ও সমস্যা সংশোধনের ও সমাধানের ঊর্ধ্বে নয়। সামগ্রিক প্রয়াসে ও সচেতনতায় সিনেমাজগতের অল্পসংখ্যক কায়েমী স্বার্থবাদী ও বিকৃতরুচিসম্পন্ন মানুষের গ্রাম্যতা ও অপকর্মকে প্রতিহত করা সম্ভব। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আজ সুদিনের জন্য দক্ষ, সৎ, মেধাবী ও সাহসী পুরুষের আত্মত্যাগের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। এ ব্যাপারে শুধু ভালো কাহিনীকার বা পরিচালকই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন দেশপ্রেমিক, সমাজহিতৈষী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রযোজক, পরিবেশক ও মুক্তিদাতা।

# হাজী মহম্মদ দানেশ

সুনীল সেন

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হাজী মহম্মদ দানেশ ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নন্দন-এ অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় রাজ্যের আইনমন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লাহ বলেছিলেন, ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শে হাজী দানেশের অটুট বিশ্বাস আর প্রগতিশীল নেতা হিসাবে তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক নয়; খিলাফতের যুগে দিনাজপুর জেলায় মুসলমান সমাজের মধ্যে যে প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল দানেশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ঠাকুরগাঁও মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। চল্লিশের দশকে যশোহরের নৌসের আলি, রংপুরের আবু হোসেন সরকার, বর্ধমানের আবুল হায়াতের মতো তিনিও প্রাদেশিক কৃষকসভার সভাপতি-পরিষদের সভ্য হয়েছিলেন। জাতীয় মুসলমান থেকে সাম্যবাদে তাঁর উত্তরণ। মুসলিম লীগ এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে তিনি আপস করেন নি। কৃষককে তিনি ভালোবেসেছিলেন, তাঁর সেই ভালোবাসায় কোন ফাঁকি ছিল না।

এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারে হাজী দানেশের জন্ম। রাজশাহী কলেজের তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র; আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস এবং আইন পড়েন। মক্কায় তিনি হজ করতে যান। ইসলামে তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস; পাঁচ বার নমাজ পড়তেন। ইসলামে বিশ্বাস রেখেও মুসলীম লীগের বাধার মুখে তিনি কৃষক-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। চল্লিশের দশকে তাঁর জীবনে দিক-পরিবর্তনের শুরু। বর্গাদারদের প্রথম সংগঠিত আন্দোলন, যা আধিয়ারি আন্দোলন বলে অভিহিত, দিনাজপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কিভাবে এই আন্দোলন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তিনি তার উল্লেখ করেছেন "দিনাজপুর জেলায় আধিয়ার বিদ্রোহের কাহিনী" প্রবন্ধে। ১৯৩৮-এর আইন অমান্য আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা বিকশিত হয় নি। কৃষকদের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এল আধিয়ার আন্দোলনের ধাক্কায়। হাজী দানেশ লিখেছেন, এর পিছনে ছিল কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব; তাঁরা "কৃষকদের মধ্যে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছিলেন।" তিনি নিজেকেও "বিলীন করে" দিলেন কৃষকদের মধ্যে। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন হল। তিনি যোগ দিলেন বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টিতে। এর জন্য তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। ওকালতিতে তাঁর পসার হয় নি। প্রায় সমস্ত জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছিল। অবস্থা-পন্ন পরিবারে যাঁদের জন্ম, সাফল্যের মই বেয়ে যাঁরা উপরে উঠেছেন, তাঁদের পক্ষে এই লড়াই যে কত কঠিন, তা বোঝা দুঃসাধ্য।

ব্রিটিশ রাজের শেষ পর্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশের উনিশটি জেলায় যে তেভাগা সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, প্রাথমিক পর্যায়ে যা ছিল প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত, দিনাজপুর জেলার ঠাকুর-গাঁও মহকুমা তার প্রধান ঝটিকাকেন্দ্র। হাজী দানেশ ছিলেন এই আন্দোলনের এক প্রধান নেতা। তেভাগা আন্দোলনে যোগদানের সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়ে-ছিল। আন্দোলনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে হাজী সাহেবের বন্ধুত্ব হল নিবিড়। কৃষকদের জনসভায় সুমধুর কণ্ঠে তাঁর বক্তৃতা মনে পড়ে। বক্তৃতা শুরু করতেন এই বলে: আমি

## স্মরণে

কৃষকের ছেলে। আমার বাবা কৃষক, ঠাকুরদা কৃষক…।" এইভাবে নিজের পরিচয় দেবার মুরোদ কতজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আছে? পার্টি লাইনের তিনি বিশেষ ধার ধারতেন না। তাঁর বক্তৃতায় থাকত কোরানের কথা, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প। কৃষকের জীবনে দুঃখবেদনা-শোষণের কাহিনী, আর সেই সঙ্গে সেই রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিকায় হিন্দু-মুসলমান রাজবংশী-সাঁওতাল কৃষকদের ঐক্যের গুরুত্ব। পিছনের দিকে ফিরে তাকালে মনে হয়, তাঁর বক্তৃতা কৃষকদের মনে ছাপ ফেলেছিল। মুসলমানপ্রধান দিনাজপুর জেলায় অসংখ্য মুসলমান কৃষক তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল; কয়েকজন কৃষক স্থানীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন। চিরিরবন্দরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন শিবরাম মাঝি আর সমীরুদ্দিন মহম্মদ। খাঁপুরে হোপন মাডি এবং চিয়ার শাই শেখ; ঠাকুরগাঁও শহরে গুলিতে বিদ্ধ হন নিয়ামত আলি এবং হীরামন বর্মণ। এক ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাজ-নৈতিক আন্দোলনের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল তেভাগা আন্দোলন, বাঙলার ইতিহাসে যার তুলনা নেই।

হাজী দানেশকে আরো পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে তাকাতে হবে বাংলাদেশের দিকে, যেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তরঙ্গের পর তরঙ্গ প্রবাহিত, দমননীতির মুখে যে আন্দোলন বার বার পিছু হটেছে; যেখানে অনেকের মধ্যে এসেছে ক্লান্তি আর সুবিধাবাদ, তবু আদর্শে অবিচল থেকেছেন কিছু বুদ্ধিজীবী। যুবক, ছাত্র, স্বেচ্ছা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাঁরা যোদ্ধা আর শহীদ, তাঁদের মধ্যে হাজী দানেশের স্থান। কিছু বামপন্থী লেখক যাই বলুন না কেন, এশিয়ার সমস্ত সদ্য-স্বাধীন দেশে বুদ্ধি-জীবীর ইতিবাচক ভূমিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যদিও তাঁদেরই একটি অংশ শাসকশ্রেণীর সামাজিক ভিত্তি। শ্রমজীবী মানুষ যে বুদ্ধিজীবীদের তাঁদের নেতা এবং মুক্তি-দাতা হিসাবে দেখেন, তা দৈবাৎ ঘটনা নয়। এখানে বলা দরকার, শহুরে মধ্যবিত্ত মানেই ঠিক বুদ্ধিজীবী নয়।

১৯৪৮ সাল। পূর্ব দিনাজপুর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তর সুযোগ এসেছে। অনেকে বেশ গুছিয়ে নিচ্ছেন। তখন হাজী সাহেব বে-আইনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে নিমগ্ন। কমিউনিস্ট পার্টিতে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের অতি-বাম লাইন চালু হয়েছে। "পার্টি লাইন" হাজী দানেশের কাছে অভ্রান্ত। দমননীতির ঝুঁকি নিয়ে ঠাকুরগাঁও-এ জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তারপর দু বছর জেলে কাটে। দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন তাঁর পরিবার। সম্ভবত তাঁর মনে ধাক্কা লেগেছিল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি দিনাজপুর কলেজে ইতিহাসে লেকচারারের চাকরি নেন। নিরাপদ মধ্যবিত্ত জীবনে ফিরে যেতে পারতেন, কিন্তু হাজী সাহেব তা পারেন নি। ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারীতে ভাষা আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ। দিনাজপুরে ভাষা আন্দো-লন এক গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিল, যার অন্যতম নেতা তাঁর ছাত্র ও সমসাময়ী ছোটো ভাই (সুরুল হুদা কাদের বক্স)। পরের বছর প্রধানত ছাত্র আর প্রগতিশীল বুদ্ধি জীবীদের নিয়ে গঠিত হল গণতান্ত্রিক দল। যার সভাপতি হাজী দানেশ। ১৯৫৪-এ কলেজের চাকরিটা গেল। ওই বছরে মুসলিম লীগ-বিরোধী দলগুলির সংযুক্ত মোর্চার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে তিনি বীরগঞ্জ-বেচোগঞ্জ কেন্দ্র থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হলেন। কিন্তু নির্বাচনের দু মাস পরেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় এক বছর কারারুদ্ধ থাকেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হয়ে তিনি ঢাকা শহরে চলে আসেন। তখনো তিনি আইনসভার সভ্য।

হাজী দানেশের রাজনৈতিক জীবনে দ্বিতীয় দিক-পরিবর্তন এল ঢাকায়। মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়; তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ক্রমশ পালটে গেল প্রধানত ভাসানীর প্রভাবে। তখনো তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত; তখনো বাম-পন্থীরা মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ। ১৯৫৭ সালে গঠিত হল জাতীয় আওয়ামী লীগ দল; তার সভাপতি ভাসানী আর সহ-সভাপতি দানেশ। সেই বছরই কৃষকসমিতির প্রতিষ্ঠা, যার সভাপতি ভাসানী এবং সহ-সভাপতি দানেশ। তাঁর পুরনো কর্মকেন্দ্র দিনাজপুর কৃষকসভায় এলেন তাঁর জামাই সুরুল হক চৌধুরী, তেজেন নাগ, আর তেভাগা আন্দো-লনের বিশিষ্ট কর্মী রাজেন সিং, আমীরউদ্দীন বর্মন, মংলু মহম্মদ, তিলক সিং। কৃষকসভার কোনো দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী রচিত হয়েছিল কি না, তা ঠিক জানা যায় নি। হাজী সাহেব বলেছিলেন, তাঁর মতো কয়েকজন বামপন্থী আইনসভার সভ্য বর্গাদারদের স্বার্থে সুরক্ষিত করার জন্য একটি বে-সরকারি বিল রচনা করেছিলেন; কিন্তু হায় শেষ পর্যন্ত বিলটি আইনসভায় পেশ করা সম্ভব হয় নি। মনে হয় তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকলেও বাংলা-দেশে কৃষক আন্দোলন বরাবর দুর্বল থেকেছে। কিন্তু কেন? নিঃসন্দেহে এর অন্যতম কারণ দমননীতি।

১৯৫৮ সালের শরৎকালে হঠাৎ জারি হল আয়ুব খাঁর সামরিক আইন। অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী আর নেতার সঙ্গে হাজী দানেশ গ্রেফতার হলেন। আবার কারাজীবন। মুক্তি পেলেন ছয় বছর পরে। নির্মম দমননীতির মুখে গণ-তান্ত্রিক আন্দোলন মুমূর্ষু; নবগঠিত জাতীয় আওয়ামী দল জনসাধারণকে সংগঠিত করার সুযোগই পেল না। অনেক রাজনীতিবিদ পিছিয়ে পড়লেন। হাজী দানেশ আদর্শভ্রষ্ট হন নি; জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৬৪ সালে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জাতীয় আওয়ামী দলকে পুন-র্গঠিত করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। দলের সম্পাদক হয়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে তিনি রাজনীতিতে মেতে উঠলেন। তাঁর মনে তখনো অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। জেলায়-জেলায় শুরু হল তাঁর পরিক্রমা। ১৯৬৭ সালে ঢাকা শহর

আলোড়িত হল ভুখ মিছিলে ; প্রায় দশ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল সেই মিছিলে ; তার পুরোভাগে দানেশ। আবার তিনি জেলে নিক্ষিপ্ত হলেন। তিনি জেলে থাকার কালে জাতীয় আওয়ামী দলে ভাঙন এল। যার কারণ ঠিক পরিষ্কার নয়। এই ভাঙন কি অনিবার্য ছিল? বামপন্থী মোর্চা ভেঙে গেল। দানেশ যোগ দিলেন ভাসানীর দলে ; কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে তাঁর বিলীয়মান সম্পর্ক ছিন্ন হল। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ভাসানীর ভাবধারা আঁকড়ে ছিলেন। এই পর্বে চীন এবং মাওবাদের দিকে তিনি আকৃষ্ট হলেন অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মতো। ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে একাধিক মার্কসবাদী দল আর গোষ্ঠী, সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে যাঁদের বিতর্ক এখনো অব্যাহত। হাজী সাহেবকে প্রশ্ন করেছিলাম। বাংলাদেশে এত পরস্পরবিরোধী দল কেন? তিনি বলেছিলেন, "তাতে কি? মানুষগুলো তো বদলায় নাই।" সম্ভবত বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা তাঁর ছিল। তাঁকে আমার মার্কসবাদী পণ্ডিত মনে হয় নি, তিনি প্রধানত গণ-আন্দোলনের নেতা। এমন সব পণ্ডিত অবশ্য দেখেছি যাঁরা কস্মিনকালে গণ-আন্দোলনে যোগ দেন নি, কিন্তু নিঃখুত নেতা?

সত্তরের দশকে ধীরে-ধীরে—এবং বোধহয় অনিবার্যভাবে—পাদপ্রদীপের সামনে থেকে তিনি সরে এলেন। ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে প্রার্থী হয়েও ভাসানীর নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে প্রচার অভিযান থেকে তিনি বিরত রইলেন এবং এক ছাত্রের কাছে পরাজিত হলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মুতিভাণ্ডারের দলে। শেখ মুজিব যাঁদের কাছে অস্পৃশ্য। যারা মূলত মাওবাদী এবং ভারতবিদ্বেষী। শেষ জীবনে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। ঢাকা থেকে চলে এসেছিলেন দিনাজপুর। নীরবে জীবনের ক্ষত তিনি সহ্য করে গেলেন। মনে হয় সেই চল্লিশের দশক থেকে জন কল্যাণ এবং সমাজপ্রগতি সাধন ছিল হাজী দানেশের অন্বিষ্ট।

হাজী দানেশের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করা হোক। যার মধ্যে আমরা তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের কাছে আমার এই প্রস্তাব রইল।

(এই প্রবন্ধের ভিত্তি হাজী সাহেবের সঙ্গে বর্তমান লেখকের সাক্ষাৎকার [ ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭১ ] যখন তিনি আমাদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। তেভাগা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য আমার বই, Agrarian struggle in Bengal, 1946—47, Delhi, 1972।)





# সংকটের আবর্তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ একটা সংবাদ। সারা ভারতে, এমনকি বহির্বিশ্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুপরিচিত নাম। জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার' ক্ষেত্রে একদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল। আজ সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। আজকের পরিচিতি অন্য কারণে।

গত দুই দশক ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবক্ষয়ের পথে চলেছিল। ভারতের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়, অথচ দরিদ্রতম বিশ্ববিদ্যালয়, নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে তার প্রতিষ্ঠা হারাচ্ছিল সারস্বতভবন হিসাবে। কিন্তু গত আড়াই বছরে এখানে 'সাংস্কৃতিক' বিপ্লব ঘটে গেছে, বাঙালির গৌরবের এই প্রতিষ্ঠানটি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদপত্রের পাতা খুললেই রোজই চোখে পড়বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ। এ নয় যে পঠনে, পাঠনে, গবেষণায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমশ যাচ্ছে এগিয়ে। এও নয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোজ্জ্বল করছে। গত দু বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত বন্ধ। "অচল বিশ্ববিদ্যালয়" হিসাবেই আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি। ধরনা, ঘেরাও, কর্মবিরতি, অবস্থান, আরও নানা ধরনের আন্দোলনের লীলাক্ষেত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে আজ পঠন-পাঠন বিপর্যস্ত ; গবেষণা তথা জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা স্তিমিত ; প্রশাসন বিপর্যস্ত ; স্বাধিকারপ্রমত্ততা অবাধ, বল্গাহীন। পূর্বে নিয়মমাফিক, ন্যূনতম কিছু-কিছু কাজ যা হত, বর্তমান সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের উপদ্রবে গত ছ মাস তাও বন্ধ। অবস্থা এমন পর্যায়ে আজ গেছে যে, উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য সংবাদে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "এই অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না।"

এ কাজটি অবশ্য তাঁকে করতে হয় নি। কেননা আন্দোলনকারীরা সেই পবিত্র কর্তব্য নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। গত তিন মাস ধরে নানা অজুহাতে তাঁরা উপাচার্যের অফিসের ভিতরে, বাইরে, চত্বরে, সিঁড়িতে, করিডরে বিক্ষোভ, ঘেরাও, শ্লোগান, গালিগালাজ চালিয়ে সারস্বতভবনকে "বামপন্থা"-র দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছেন। তাঁরা উপাচার্যকে দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়চত্বরে পা দিতে দেন নি, গাড়ি হতে তাঁকে নামতে দেন নি, গাড়ির চাকা ফুটো করে দিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ গাড়ির ভিতরে আটক থেকে উপাচার্য আন্দোলনকারীদের অশালীন মন্তব্য, "উপাচার্যের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও" প্রভৃতি সুশ্রাব্য শ্লোগান শুনেছেন। তারপর পুলিশ যখন তাঁকে জানিয়েছে যে, আন্দোলনকারীরা কোনোমতেই তাঁকে গাড়ির বাইরে পা দিতে দেবে না, তখন তিনি নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। উপাচার্য যখন ঘোষণা করলেন যে, তিনি বাড়িতে বসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনা করবেন, তখন আন্দোলনকারীরা অফিসে 'হুকুমনামা' জারি করলেন—"কোনো ফাইলপত্র উপাচার্যের বাড়িতে নেওয়া চলবে না।" বিস্ময়ের বিষয় : এই অবস্থায়, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী নির্মল বসু বাণী দিলেন "বাড়িতে বসে কাজ করবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হয় নি। উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেই হবে।" মন্ত্রীমশাই আরও জানালেন, "কিছু হামলাকারীকে ভয় পেয়ে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি থেকে কাজকর্ম করবেন, এরকম নজির ইতিহাসে নেই।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পিছনকার রহস্যটা কী? এটা কি অ-গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী এক উপাচার্যের সঙ্গে প্রগতির শক্তির লড়াই? বিশ্ববিদ্যালয় তো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ধর্মাধিকরণের মতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকট, ১৯৭৭, তো বর্তমান সরকারেরই তৈরি। সেই অ্যাকটের ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চলবে, যে ক্ষমতা উপাচার্যের উপর ন্যস্ত সেই ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করবেন তাঁর বিচার-বিবেচনা-মতো। আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বিমত হলে বিষয়টি যাবে চ্যানসেলারের কাছে। কিন্তু মাঝে-মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীদের হুঁশিয়ারি আর হুমকি শোনা যায় কেন? কেন মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "সন্তোষ ভট্টাচার্য আমাদের লোক নন।" বিশ্ববিদ্যালয় আইনে তো শিক্ষা-

মন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর কোন আইনি ভূমিকা নেই। অন্যদিকে, দিনের পর দিন আন্দোলনকারীরা যে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করছে, কাজ না ক'রে নির্বিবাদে বেতন নিচ্ছে, সে বিষয়ে মন্ত্রীমহোদয়দের তুষ্ণীভাব কেন? প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রশ্রয় কেন? উপাচার্য যখন লাঞ্ছিত হন, অফিসাররা হন নিগৃহীত, অধ্যাপকেরা যখন হন অপমানিত তখন "প্রগতিপন্থী" সরকার প্রকারান্তরে আন্দোলনকারীদের সপক্ষে "বাণী" দেন কেন?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সমস্যার উৎস বর্তমান সরকারের ভ্রান্ত রাজনীতিতে। ক্ষমতায় আসীন হয়ে এঁরা বলদর্পে আত্মহারা। এঁদের ধারণা শিক্ষার সর্বস্তরে বামফ্রন্টের একাধিপত্য—hegemony—স্থাপন করতে হবে। তবেই দেখা দেবে শিক্ষায় প্রগতি। ফলে, শিক্ষার সকল স্তরে, সব পর্যায়ে, স্কুলে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। পার্টির লোক দেখে-দেখে এঁরা উপাচার্য করেছেন, মাধ্যমিক বোর্ড উচ্চশিক্ষা কাউনসিলের সভাপতি মনোনীত করেছেন। কলেজ সারভিস কমিশনে সদস্য নিয়েছেন দল এবং রাজনীতির স্বার্থে। স্কুলে, কলেজে পরিচালকমণ্ডলী এমনভাবে গঠন করেছেন যাতে দলীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। পাঁচ বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করেছেন মনোনীত কাউনসিলের সাহায্যে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নতুন আইন এমনভাবে রচনা করেছেন, যাতে উচ্চতম শিক্ষায়তনে দলীয় প্রাধান্য অটুট থাকে। এইভাবে শিক্ষার রাজ্যে স্থাপিত হয়েছিল রাজনৈতিক মধুচক্র। দল করলে সবাই রাজা এই রাজত্বে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পার্টি-নায়কতা স্থাপিত হয়েছিল প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রকুমার পোদ্দারের আমলে। নানা কারণসম্পিপাতে আড়াই বছর আগে ডঃ পোদ্দার পরাজিত হলেন। সাংবিধানিক পদ্ধতিতে, বিধিবদ্ধ উপায়ে, নতুন উপাচার্য হলেন ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য। সেদিন থেকেই "প্রগতির" ধর্মযুদ্ধের শুরু। সেই যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশলের হেরফের হয়েছে। কখনো সিনডিকেট সভায় ফোরাম ফেল করানো, কখনো চ্যানসেলার এ. পি. শর্মার বিরুদ্ধে লড়াই, কখনো সিনডিকেট ও সিনেট সভায় বে-আইনি প্রস্তাব পাশ করানোর চেষ্টা, কখনো উপাচার্যকে অমান্য করতে রেজিস্ট্রারকে উশকে দেওয়া, কখনো বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে আটকাবার জন্য মামলা রুজু করা। কখনো প্রচারাভিযান—"উপাচার্য সিনডিকেট আর সিনেটকে এড়িয়ে গিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছেন।" কখনো বিচারাধীন পাঁচ কর্মচারীর বিষয়টিকে তুলে ধরা, বলা—"আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে অন্যায়ভাবে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়েছে।" কখনো অরডিনানস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের "আইন" আবার পালটানোর প্রচেষ্টা এবং উপাচার্যকে অপসারণের অপচেষ্টা। রণকৌশল (strategy),—বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো দখল চাই, সন্তোষ ভট্টাচার্যকে পলায়নে বাধ্য করতে হবে। রণনীতি, (tactics) বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি। সৈন্যপত্য বামফ্রন্টের, প্রধানত বড়ো শরিকের।

কথাগুলো মন-গড়া নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন (সভাপতি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য)—C.U.T.A—এই কথাই বলেছেন তাঁদের প্রস্তাবে। তাঁরা বলেছেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জোর, জবরদস্তি, নিগ্রহ, লাঞ্ছনার ঘটনা প্রায় প্রাত্যহিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজকর্ম বন্ধ থাকছে।"

কথা উঠেছে এবং প্রচার হয়েছে, সন্তোষ ভট্টাচার্য মশাই প্রায়ই জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করেন (৯/৬ ধারা)। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্র পোদ্দারের তুলনায় সন্তোষ ভট্টাচার্য অনেক কম ৯।৬ ধারায় ন্যস্ত জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন। তফাতটা এই, ডঃ পোদ্দার শাসকদলের আস্থাভাজন "আমাদের লোক" ছিলেন, ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য তা নন। আর-একটা তফাত, রাজনীতির কর্তাদের নির্দেশে ডঃ পোদ্দার বিবিধ বেনিয়মি কাজ করেছেন দলের স্বার্থে এবং নির্দেশে; নির্দল সন্তোষ ভট্টাচার্যকে দিয়ে সেই ধরনের কাজ করানো সম্ভব নয়।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনেই ৯।৬ বা অনুরূপ ধারা থাকে, বর্তমান সরকার রচিত ১৯৭৭-অ্যাক্টেও সেই ধারা আছে। ওই ধারা প্রয়োগ না করলে প্রশাসন চলে না। আইনেই আছে, ওই ধারা প্রয়োগ করে যতশীঘ্র সম্ভব উপাচার্য বিষয়টি সিনডিকেট সভায় রিপোর্ট করবেন। সিনডিকেট যদি কাজটি অনুমোদন না করে তবে সেটি যাবে চ্যানসেলারের কাছে। চ্যানসেলারের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। সন্তোষ ভট্টাচার্য কি ৯।৬ ধারা প্রয়োগ করে সিনডিকেটকে অবহিত করেন নি? করেছিলেন। সিনডিকেট কী করেছিল? "না গ্রহণ, না বর্জন"। কাজেই বিষয়গুলি ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলে আছে, চ্যানসেলারের কাছে







পৌঁছায়নি। এরই নাম—"সিনডিকেটকে এড়িয়ে" উপাচার্যের অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ!

পাঁচ কর্মচারীর কাহিনীটা কী? বিদায়ের প্রাক্কালে উপাচার্য রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার "জরুরি" ক্ষমতাবলে ৩৩ জন 'দলীয়' ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র দেন। যেসব নিয়োগ তিনি করে যান তার সবই নিয়মবহির্ভূত, আইনি প্রথা-প্রকরণ না মেনে। যাঁরা চাকুরি পান তাঁদের মধ্যে অনেকেই বামফ্রন্টের বড়ো শরিকের "activists"—সক্রিয় কর্মী। এইসব নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ সম্পর্কিত ফাইল দেখে নতুন উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য নিশ্চিত হন যে, নিয়োগগুলি স্বাভাবিক নয়; ভুয়া দলিল, মিথ্যা সার্টিফিকেট দেখিয়ে, কর্তাদের আনুকূল্যে এইসব নিয়োগ ঘটে।

উপাচার্য ভট্টাচার্য ২০।১২।৮৩ তারিখে সিনডিকেট-সভায় এই বিষয়ে তাঁর মতামত-সংবলিত এক বিস্তৃত রিপোর্ট দেন। সিনডিকেট রিপোর্ট বিচার না করে উপাচার্যকে বলে, "আপনি রিপোর্টটি তুলে নিন এবং নিয়োগগুলি অনুমোদন করে দিন।" উপাচার্য সিনডিকেটের কথামতো ২৮ জন কর্মচারীকে স্থায়ী করলেন। এদের নিয়োগপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এদের দরখাস্ত আর অন্যান্য কাগজপত্রে জালজুয়াচুরি ছিল না। যে পাঁচজন কর্মচারীর কাগজপত্রে জালজুয়াচুরির আপাতগ্রাহ্য নিদর্শন ছিল, এবং যাঁদের চাকুরি ছিল 'প্রবেশনার' হিসাবে, সেই পাঁচ জন কর্মচারীর কর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে উপাচার্য প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত নেবার পরও আপাতগ্রাহ্য অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার জন্য উপাচার্য একটি 'কমিটি' গঠন করেন। সেই কমিটিতে ছিলেন, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন মুখার্জি [ সহ-উপাচার্য, অর্থ ], অধ্যাপক এম এল উপাধ্যায় [ অধ্যক্ষ, আইন কলেজ ] এবং অধ্যাপক অনাদিনাথ দাঁ। এঁরা সকলেই সিনডিকেটের সদস্য। এই কমিটির রিপোর্ট উপাচার্যের প্রশাসনিক অনুসন্ধানের ফলাফলকে সমর্থন করায় উপাচার্য সিদ্ধান্ত নেন—পাঁচ কর্মচারীর পরীক্ষাকাল (প্রোবেশন) উত্তীর্ণ হবার পর এঁদের আর স্থায়ী করা চলে না। ১৯৮৪-র জুন মাসে এদের কর্মচ্যুতি ঘটে। এর আগে এদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়। তবে কর্মচারীরা সেই বৈঠক ভণ্ডুল করে দেয়।

পাঁচজন সক্রিয় পার্টি-কর্মীর কর্মচ্যুতি,—কী সাংঘাতিক কথা! ডঃ রমেন্দ্র পোদ্দার যে মধুচক্রের স্থপতি সেই মধুচক্র ভাঙতে ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য উদ্যত! তাকেই কিনা বিনা যুদ্ধে মেদিনী দিতে হবে! কাজেই, যুদ্ধ চলছে, চলবেও। যুদ্ধ চলবে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে, করিডরে, স্যার আশুতোষ মূর্তির পাদদেশে, কাজ না করে, উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে ঢুকতে না দিয়ে ও অন্যান্য "বিপ্লবী" কায়দায়। যুদ্ধ চলবে—সাংবিধানিক পথে, ধর্মাধিকরণে, অসংখ্য মামলা রুজু করে। ঠিক সেই কারণেই, পাঁচ কর্মচারীর মামলা হাইকোর্টে রয়েছে, শুনানি আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তথাপি অশান্ত, সংগ্রামের কলকোলাহলে মুখরিত।

যে আন্দোলনে আজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়-অচল, যে আন্দোলনের কাহিনী পড়ে সারা ভারতে আজ বাঙালির ইজ্জত আর সম্মান ক্ষুণ্ণ, যার পরিণামে ছাত্রদের পড়াশুনা, পরীক্ষা সবই বিপর্যস্ত, প্রশাসন দিশেহারা, সেই আন্দোলন কিন্তু নেপথ্যের রাজনৈতিক নায়কদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে "আমাদের লোক নয়" এমন যে ব্যক্তিটি উপাচার্য হয়ে বসে আছেন, তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা। উপাচার্য-অপসারণের কৌশল হিসাবেই বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে প্রাত্যহিক অমার্জিত, উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা, অশালীন দৌরাত্ম্য সারস্বতভবনের শুচিতাহানি। উপাচার্যের অপসারণ যদি সম্ভব না হয় তবে অন্তত তাকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করতেই হবে।

স্বাধিকারপ্রমত্ত, সর্বগ্রাসী রাজনীতি বড়ো নিষ্করুণ।

# প্রিটোরিয়ার লড়াই

রাজা ক্যানিউটের নামে মিথ্যা একটা অপবাদ সাধারণের মধ্যে অনেক দিন ধরে প্রচলিত আছে। আসল গল্পটা হল, জোয়ারের সমুদ্রকে যে তিনি তাঁর রাজদেহের দিকে আর এগোতে নিষেধ করেছিলেন, সে কেবল তাঁর চাটুকারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে যে, সমুদ্রের জোয়ারভাঁটা রাজাজ্ঞা মানে না, মানে প্রকৃতির নিয়ম। আসলে তিনি জ্ঞানী লোকই ছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া সরকার এমন একটা নীতি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বসে আছে যাতে মনে হতে পারে রাজা ক্যানিউটের শিক্ষা তাঁকে নতুন করে গ্রহণ করতে হবে। জগৎ-পারাবারে এখন বর্ণভেদবাদের বিরোধী একটা জোয়ার এসেছে। প্রিটোরিয়ার কানেও তার খবর পৌঁছেছে অনেক দিন আগে। একে একে তাকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ছাড়তে হয়েছে, জাতিসঙ্ঘ ছাড়তে হয়েছে। পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে নিন্দিত রাষ্ট্র কোন্‌টি? দক্ষিণ আফ্রিকা। সবচেয়ে নিন্দিত ব্যবস্থা কী? আপার্টহাইট। বলতে গেলে সারা পৃথিবীই এখন কোন্ বিষয়ে একমত? দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের পূর্ণ নাগরিকদের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। আফ্রিকীয় জাতীয় কংগ্রেসকে প্রিটোরিয়া অস্বীকার করতে পারে, অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাতে পারে, কিন্তু কালের গতি ঠেকিয়ে রাখবার ক্ষমতা কার আছে? এই অসম যুদ্ধে কে তার পাশে দাঁড়াবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?

গত ২৩ জুলাই ওয়াশিংটনে ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স কাউনসিল এবং ফরেন পলিসি অ্যাসোসিয়েশনের এক যুক্ত সভায় প্রেসিডেন্ট রেগান বলেন, "দক্ষিণ আফ্রিকায় যে গোলযোগ চলছে তার মূল কারণ আপার্টহাইট, বর্ণভেদের সেই কঠোর নীতি যা কৃষ্ণাঙ্গদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রেখেছে।" তিনি আরও বলেন, "আপার্টহাইট সম্পর্কে আমেরিকার অভিমত আগেই পরিষ্কার ছিল, এখনও পরিষ্কার: "আপার্টহাইট ইজ মর‍্যাল রঙ অ্যানড পলিটিক্যালি আনঅ্যাকসেপটেবল"।

## দেশে বিদেশে

পরে তিনি রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে কী কী ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে মনে করেন, তার একটি তালিকা দেন:

প্রথম, আপার্টহাইট সংক্রান্ত আইনসমূহের বিলোপের জন্যে একটি কর্মসূচি নির্ধারণ;

দ্বিতীয়, সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি;

তৃতীয়, নেলসন মেনডেলার মুক্তি, যাতে তিনি দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারেন।

চতুর্থ, কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনসমূহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার;

পঞ্চম, সরকার এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত, যার বিষয় হবে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি, শাসিতদের সম্মতির ওপর যেটি স্থাপিত, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের, সংখ্যালঘুর এবং ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত থাকে। এই আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে তাদেরই, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব যাদের হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার।

অর্থাৎ, রোগের নিদান হল, ওষুধের বিধান হল। কিন্তু রোগী যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে, দাঁতে দাঁত চিপে থাকে? তখন কী ব্যবস্থা? ইতিমধ্যে বিশ্বজনমতের জোয়ার আরও ফুঁসে উঠছে। ডাকতার রেগানের ব্যবস্থাপত্র কি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে চলে গেল? তারপরে প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক বন্দীরা এখনও বন্দী, মিঃ নেলসন মেনডেলার আসন্ন মুক্তির গুজব মাঝে-মাঝে শোনা যায় বটে, কিন্তু তিনিও এখন পর্যন্ত কারাগারে। আপার্টহাইট আইন কোনো-কোনো বিষয়ে একটু শিথিল আগেই করা হয়েছিল, কিন্তু তার বিলোপের কর্মসূচি কোথায়? কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল, যে জরুরি আইনের কঠোর সমালোচনা আমেরিকাও করেছিল, তাও বহাল। এদিকে যেসব প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রিটোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয়, তাদের সম্পর্কে তার মনোভাব আরও কঠোর হচ্ছে। জামবিয়া এবং জিমবাবোয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেবে বলে ঘোষণা করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রিটোরিয়া ওই দুটি দেশের রপ্তানি পণ্যের দক্ষিণ আফ্রিকার ভিতর দিয়ে চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এই অবস্থায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রিটোরিয়া যে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শুরু করবে, শাসিতদের, অর্থাৎ সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের, সম্মতির ওপর স্থাপিত নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনের দিকে এক-পাও এগোবে, সে সম্ভাবনা ঠিক এই মুহূর্তে যে এমন-কি প্রেসিডেন্ট রেগানেরও দৃষ্টিগোচর বলে মনে করা কঠিন।

অন্তত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নতুন কিছু-কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে আমেরিকাও ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে, তা তো দেখাই যাচ্ছে। নিষেধ জারি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাসমূহকে কোনো মার্কিন অর্থনৈতিক সংস্থার ঋণদানের ওপর, দক্ষিণ আফ্রিকার রপ্তানি বাণিজ্যে মার্কিন আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্কের সহায়তা প্রদানের ওপর। তাছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকাতে অস্ত্র রপ্তানির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ১৯৬২ থেকে চালু আছে, তাও বহাল রাখা হয়েছে।

ব্রিটেনও স্বেচ্ছায় দক্ষিণ আফ্রিকাতে নতুন করে অর্থবিনিয়োগ নিষেধ করেছে, এবং সে দেশ থেকে কয়লা, ইস্পাত এবং লোহা আমদানি নিষেধ করার ব্যবস্থা নিতে চেয়েছে, যদি ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিশন, সেই সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু এতেই যে কাজ হবে, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আমূল সংস্কারের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রিটোরিয়া রাজি হবে, তার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত আমরা কেউ দেখতে পাচ্ছি না। এমন-কি, লনডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ খুদে-শীর্ষবৈঠকে ব্রিটেনকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেগে অন্য ছটি দেশ যে কঠোরতর শাস্তিবিধানের সংকল্প ঘোষণা করেছে তাই যে কত ফলপ্রসূ হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। বরং মনে হয়, একপক্ষের কঠোরতার সঙ্গে তাল রেখে অপর পক্ষের কঠোরতাও বেড়েই চলেছে।

এর কারণ কী, নিজের শক্তির ওপর মাত্রাতিরিক্ত ভরসা, না, অনাগত সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত ভয়?

ভরসা থাকিকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং তাদের পশ্চিম-ইউরোপীয় মিত্রদের ওপরও বটে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান শাসনব্যবস্থা এবং বিশেষত আপার্টহাইট সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধ মনোভাব এবং সম্প্রতি গৃহীত তাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও, তাদের দিক থেকে প্রিটোরিয়া সম্ভবত এখনও এমন কোনো পদক্ষেপের আশঙ্কা করে না, যাতে দক্ষিণ আফ্রিকার মজবুত অর্থনীতি মারাত্মকভাবে জখম হবে। প্রেসিডেন্ট রেগান বারেবারে জানিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতিকে তেমনিভাবে জখম করতে তিনি রাজি নন। এই আপত্তির কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর উল্লিখিত ভাষণে। তিনি বলেছেন, আফ্রিকার দক্ষিণভাগ এক অখণ্ড অর্থনৈতিক সত্তা। দক্ষিণে অবস্থিত জায়রের খনি অঞ্চল তার খাদ্য এবং পেট্রোলিয়ামের তিন-চতুর্থাংশের জন্যে দক্ষিণ-আফ্রিকার ওপর নির্ভর করে। জামবিয়ার রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ এবং জিমবাবোয়ের রপ্তানির শতকরা ৬৫ ভাগ দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরগুলি দিয়ে বাইরে যায়। মোজামবিকের রাজধানীতে যে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হয়, তার অর্ধেকের বেশি আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। তা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে কাজ করে সোয়াজিল্যান্ডের ১৩ হাজার শ্রমিক, বোটসোয়ানার ১১ হাজার, মোজামবিকের ৫০ হাজার এবং ছোট্ট লেসোথোর ১ লক্ষ ১০ হাজার। এই-সব খনি যদি অর্থনৈতিক বয়কটের ফলে বন্ধ হয়ে যায়, সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হবে এইসব দেশের। এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট রেগান একজন আফ্রিকীয় নেতার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন "দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জেব্রার মতো, তার সাদা অংশগুলি যদি জখম হয়, কালো অংশগুলিও মারা যাবে।"

দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট রেগান বলেছেন, আপার্টহাইটের দিন যে শেষ হয়েছে প্রিটোরিয়া, দেরিতে হলেও তা এখন বুঝতে পেরেছে। গত কয়েক বছরে "নাটকীয় পরিবর্তন" হয়েছে সে দেশে। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সারা আফ্রিকায় তাদের ইউনিয়নগুলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, এবং স্বাধীন। কুখ্যাত দাস-আইন প্রত্যাহৃত হয়েছে, এবং অবসান ঘটানো হয়েছে আরও অনেক আইনের যেগুলি দেশের বিভিন্ন শহরে কৃষ্ণাঙ্গদের বসবাস, চাকরি এবং সম্পত্তির মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এবং সাধারণের ব্যবহারযোগ্য সুযোগ-সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে বর্ণভেদের অবসান হয়েছে।

কাজেই, প্রেসিডেন্ট রেগান সম্ভবত মনে করেন, এত সব যদি সম্ভব হয়ে থাকে, বাকিটুকুও সম্ভব হবে, যাকে তিনি "কনস্ট্রাকটিভ এনগেজ-

মেন্ট" বলেছেন তার দ্বারাই।

এখন এই "বাকিটুকু" সমাধা করবার প্রকৃত ইচ্ছা প্রিটোরিয়ার আছে বলে যদিও আপাতত মনে হচ্ছে না, তবু মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ওপর তার ভরসা, তারা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করবে না।

এই হল ভরসার দিকটা। ভয়ের দিক হচ্ছে, একবার যদি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গের আধিপত্যের অবসান হয়, তখন "আমাদের কী হবে?" শ্বেতাঙ্গদের এই একটা আশঙ্কা, এবং সে আশঙ্কা তাদের সর্বত্তরে।

ধনীরা মনে করছেন সম্পত্তিচ্যুত হব, শিল্পপতি ভয় করছেন সরকার পদে-পদে কারবারে হস্তক্ষেপ করবে, সাধারণ লোক মনে করছেন, চাকরি যাবে। এই অবস্থায় যদি প্রিটোরিয়া সরকার সত্যিকারের কোনো পদক্ষেপ সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার দিকে গ্রহণ করে, তার আসন টলমল করে উঠতে বাধ্য।

তা হলে উপায় কী? বিশ্বব্যাপী ধিক্কার, অর্থনৈতিক অবরোধ, কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ, সশস্ত্র সংগ্রাম। এর সঠিক উত্তর কারোই জানা আছে বলে মনে হয় না।

আমেরিকা, ব্রিটেন এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী যদি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে তাদের বর্তমান মনোভাব পরিবর্তন করে, তবে, হয়তো প্রিটোরিয়া উপলব্ধি করবে, সময়ের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে জেতা যায় না, যা পছন্দ নয়, তাকেও হজম করতে হয়। দুটি খারাপের মধ্যে একটাকে যখন বেছে নিতেই হবে, তখন যেটা কম খারাপ সেটা বেছে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গেরা কবে বুঝবেন, কৃষ্ণাঙ্গের হাতে শাসনক্ষমতা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে যতই খারাপ হবে, তার চেয়েও খারাপ হতে পারে সময় থাকতে সে সম্ভাবনা মেনে না নিলে।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়


**NILMONI DAS (IRONMAN)'S**

1. EXERCISE FOR HEALTH ..... Rs. 10
2. YOGA BYAYAM FOR HEALTH ... Rs. 12
3. HOW TO BE TALLER ..... Rs. 10
4. योग से रोग मुक्ति ..... Rs. 15
5. VARIOUS EXERCISE CHARTS ... Rs. 2

CONTRACT
YOGA THERAPHY CENTER
SEPARATE ARRANGEMENT
FOR LADIES.

THE BOOK CONTAINS
YOGIC CURES WITH
ILLUSTRATION SUITABLE
FOR MEN AND WOMEN
OF DIFFERENT AGES.

IRONMAN PUBLISHING HOUSE
2, AMHERST ROW, CALCUTTA-700 009, PHONE : 35-3155

HOW TO BE TALLER
BY
NILMONI DAS
(IRON MAN)
A SCIENTIFIC AND WELL-TRIED HEIGHT-INCREASING FREE-HAND EXERCISE AND YOIGIC ASSAN BOOK FOR INCREASING HEIGHT OF BOYS & GIRLS, MEN & WOMEN
FROM 12 TO 24 YEARS
PRICE RS. 10/-
HOW TALL ARE YOU ?
IRON MAN PUBLISHING HOUSE
2, AMHERST ROW CAL-9
PHONE 35-3155





# IN-LAWS OR OUTLAWS

There is nothing like a dowry to give any marriage a bad name. And a bad start.

It takes your son's pride away.
It makes your daughter lose her dignity.
It strains family relations for generations to come.

*Help eradicate dowry.*
Educate your children.
Don't subsidise a marriage.

*Remember, Dowry is prohibited by law.*

Progressive-UIB-6/84

UIB—With the people ... for the people.

**UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED**
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001